উৎসর্গ

আশিস দত্ত ও সুধাংশু গুপ্তকে

নানা সময়ের নানা রচনা আছে ছড়ানো। তারই কিছু একসঙ্গে গেঁথে ছাপা হল 'ভুবনজোড়া আসনখানি।' দেশে বিদেশে অনেক কিছু দেখা এবং অনেক কিছু শোনার পর চোখ আর মন থেকে তা' সরতে চায় না। এই সংকলন সেই দেখাশোনারই প্রতিচ্ছবি। বইটি ছাপা হল শ্রীমান অমিতাভ চক্রবর্তীর আগ্রহে এবং শ্রীমান অরুণ ঘোষের চেষ্টায়। বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হলে পরেই তাদের ধন্যবাদ জানাব।

—অ. চৌ.

## মাবুহোয় ম্যানিলা

আবার আমেরিকা ঘুরে এলাম, আমেরিকায় না গিয়েও। সেই ড্রাগ স্টোর, সেই কাফেটারিয়া, সেই স্লটমেশিন এবং সেই অনিবার্য 'হাই' সম্বোধন। চলনে বলনে জীবনযাপনে কী শহর কী গ্রাম মনে হবে যেন ক্যালিফরনিয়া কিংবা আরিজোনা। যেন মারকিন যুক্ত-রাষ্ট্রের পঞ্চাশোর্ধ একান্নতম পীঠ।

ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের কথা বলছি। আজ বহু বছর হল সে আমেরিকার হাতছাড়া, তবু 'আমরিকী কালচার' তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। আমেরিকার যে কোন শহর বা গ্রামে গেলে যেমন চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তার সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষা হয়, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে পা দিলেও অনেকটা তাই। তার অর্থনীতিতে মারকিন দাক্ষিণ্য কতখানি কিংবা মারকিন সামরিক ঘাঁটির বিনিময়ে কতটা সে বিশেষ একটি জোটে বলগা-টানা, সে প্রসঙ্গ মুলতুবি রেখেই বলা যায়, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে শত শত দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তার সর্বাধুনিক ভঙ্গী দিয়ে আমার মত যে কোন ভারতবাসীর চোখ ভুলিয়ে দিতে পারে।

এবং তার সঙ্গে উপরিপাওনা প্রাচ্যসুলভ মেজাজ। কিপলিঙের বহু উদ্ধৃত সেই অসাধারণ উক্তির মুখে ছাই দিয়ে পূর্ব এবং পশ্চিম—বিভাস পূরবী ও—মিলেছে ওখানে। ফিলিপিনসের প্রকৃতি একেবারে ছাঁচে ঢালা দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের। ম্যানিলার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে কোন গ্রামের সীমানায় গেলে মনে হবে যেন জলপাইগুড়ি কিংবা ভিজিয়ানাগ্রামের ভিতর দিয়ে চলেছি। সেই আম-কাঁঠাল, কলা-

নারকেল, বাঁশ গাছের ঝাড়, পুকুরের জল আর গাছের ছায়ায় ঘেরা কাঠের তৈরি বাড়ি, মোষের গাড়ির একটানা পথচলা আর নির্জন দুপুরের বিষণ্ণ উদাসীনতা। মাইলের পর মাইল পথের দু'ধারে সেই শস্যক্ষেত, হরিৎ বর্ণের অপরূপ সমারোহ। শুধু চমক লাগে হঠাৎ কোন গাঁয়ে ঢুকে চাষীর ঘরে এয়ারকুলার কিংবা টেলিভিশন দেখলে।

এই পল্লী প্রকৃতি অবশ্য ফিলিপিনসের একচেটিয়া নয়। কলকাতা থেকে ব্যাংকক হংকং হয়ে ম্যানিলা এবং ম্যানিলা থেকে সিঙ্গাপুর (সিংহপুর বলি না কেন, স্থানীয় লোকেরা তো এখনও তাই বলে) কুয়ালালামপুর (নাকি কুমাররামপুর?) হয়ে ফের কলকাতা আসা-যাওয়ার এই পথের ধারে যেটুকু সেবার ১৯১৭ আমার স্বল্পদিনের বিদেশ সফরে দেখেছি, তাতে বারবার আমার মনে পড়েছে উত্তর ও পূর্ব বাংলার কথা। শহরের সমৃদ্ধি বাদ দিলে গ্রামাঞ্চলের প্রকৃতি হুবহু এক। একজন থাই, কিংবা ফিলিপিনো কিংবা 'মালে'-কে মিজো টিপরাই কিংবা গারো বলে সহজে চালিয়ে দেওয়া যায়। একজন গুজরাতী কিংবা পানজাবীর চেয়ে একজন থাই, লাও, ভিয়েতনামী কিংবা ফিলিপিনোর সঙ্গে বাঙালীর যেন মিল বেশি। শুধু পল্লীপ্রকৃতিতে নয়, আকারে এবং প্রকারে। কেরল থেকে তামিলনাদ, অন্ধ্রপ্রদেশে ওড়িশা বাংলা, আসাম, ব্রহ্মদেশ হয়ে ফিলিপিনস্ তণ্ডুলভোজী এই এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল গম-ভোজীদের থেকে আলাদা শুধু খাদ্যের কারণে নয়, পল্লীপ্রকৃতি ও জাতিগত কারণে। ম্যানিলায় বসে আমকাঁঠাল-মাগুর মাছ, উচ্ছেভাজা আর কচুশাক যদি খাওয়া যায়,—যেমন আমার বন্ধুপত্নী তাঁর গৃহে আমাকে নিত্য খাইয়েছেন—আর সঙ্গে যদি টি-ভি ক্যাডিলাক সুপারমারকেট সুপারহাইওয়ে থাকে, তাহলে তার প্রশংসা 'সুপারলেটিভ' না হলে কি চলে?

ভালো অবশ্য লাগতে শুরু করে সফরের গোড়া থেকেই। সত্তর সালের তিরিশে জানুয়ারির দুপুর বেলা ব্যাংককে পা দিয়েও মনে হয়নি ভারতের বাইরে রয়েছি। বৃহত্তর ভারত আমার জেটবিমানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কাসটমস আর ইমিগ্রেশনের ঝামেলা চুকিয়ে বাইরে

দাঁড়ানোমাত্র এয়ার ইনডিয়ার যে থাই হোস্‌টেস আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন, তার নাম চিত্রা। তিনি নমস্কার করে বললেন, 'এই নিন ভাউচার, ওই ট্যাক্‌সিতে চড়ে চলে যান 'হোটেল-রাম'-এ। ট্যাক্‌সি ড্রাইভার সহাস্যে এগিয়ে এসে বললেন, তার নাম মনোজ। তিনি রাজবীথি বরাবর এগিয়ে ( কী সুন্দর নাম, অথচ আমাদের দেশে এখনও কিংস্ অ্যাভিনিউ কুইন্‌স্ অ্যাভিনিউ আকছার) কীর্তি-কাচরণ স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে ছুটে হোটেলে পৌঁছে দিলেন। হোটেলের রিসেপসন কাউনটারে দণ্ডায়মান হাস্যমুখীব জামায় দেখলাম লেখা –'মিস অপ্সবা।' লবি থেকেই দেখা যায় সুইমিং পুল। পুলের জল ফোয়ারার আকারে যে মূর্তিটির ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে আসছে, তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং মহাদেব। গঙ্গাবতরণেব দৃশ্য।

প্রায় একই অভিজ্ঞতা অন্যত্র। নামেধামে সর্বত্র রামায়ণ-মহাভারতের সংস্কৃতি। ইন্দোনেশিয়া ও কামবোডিয়াতে তো আরও বেশি ! মুসলমান বা বৌদ্ধ হয়েও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাব স্মৃতি তাঁরা বহন করে চলেছেন। জাভার কোন মুসলমানের নাম সুকান্ত কিংবা লাওসের কোন খৃস্টানের নাম চন্দ্ররাজ হলে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তবে পল্লীপ্রকৃতি ও ভাতের প্রতি আসক্তি বাদ দিলে ফিলিপনস সংস্কৃতির বিচারে বৃহত্তর ভারতের বাইরে। ভারতীয় ধর্ম একদিকে তিব্বত চীন কোরিয়া হয়ে গিয়েছে জাপানে, অন্যদিকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম গিয়েছে ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, কামবোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায়। পরবর্তী ফিলিপিনসে সেই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়েনি। ইন্দোনেশিয়া-সংলগ্ন দু'একটি দ্বীপে দু' একজন রাজা সম্পর্কে কিংবদন্তী এব এক আধটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন নেই। হয়ত ফিলিপিনস তাদের মন জয় করতে পারেনি কিংবা হয়ত তাদের প্রভাব বিস্তারের মুহূর্তে আরও পরাক্রমশালী আরব, স্পেনীয় ও পর্তুগিজ জলদস্যুর দল তাঁদের বিজয়পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে।

ফিলিপিনসের আদি ইতিহাস কিছু কিংবদন্তী আর কিছু রহস্যে ঢাকা। ঘড়ির পেনডুলামের মত পর পর ঝুলছে সহস্র মাইল দীর্ঘ এই দ্বীপপুঞ্জ। বড় দ্বীপ লুজন—সেখানেই রাজধানী ম্যানিলা! তারপরেই মিনডানাও, যার বড় শহর ডাভাও। তাছাড়া রয়েছে সেবু, ইলোইলো, মিনদোরো, সুলু বহল ইত্যাদি অসংখ্য দ্বীপ। যোগাযোগের সূত্র বিমান কিংবা ফেরিবোট। দূর অতীতে দু'একটি দ্বীপে ছিল মুসলমান রাজত্ব। তার মধ্যে সব চেয়ে কীর্তিমান রাজা সোলেমান। আজ থেকে প্রায় চারশ বছর আগে স্পেনীয় বণিক ও জলদস্যুরা তাকে পরাজিত করে লুজন দ্বীপ দখল করে। তারপর একে একে সংলগ্ন সব দ্বীপ একই শাসনে এনে একটি রাষ্ট্রের আকার দেয় এবং স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নামে নতুন রাজ্যের নাম দেয় ফিলিপিনস ( ফিলিপাইনস কদাচ নয় )। স্পেনের এই সুদীর্ঘ শাসন চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছে ফিলিপিনোদের দেহে এবং মনে। ধীরে ধীরে শতকরা প্রায় নব্বুইজন হয়ে গেলো রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান, গ্রহণ করল পাশ্চাত্য আদবকায়দা, ভুলতে লাগল নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

১৮৯৮ সালে স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধের পর মারকিন যুক্তরাষ্ট্র দুই কোটি ডলার গুণে দিয়ে স্পেনের কাছ থেকে কিনে নেয় সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ। ১৯৩৪ সালে মার্কিন কংগ্রেস তাকে মর্যাদা দেন কমন-ওয়েলথের। তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ফিলিপিনস কিছুদিন রইল জাপানীদের দখলে। তারপর যুদ্ধশেষে ১৯৪৬ সালের চৌঠা জুলাই মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনতা ছিন্ন করে ফিলিপিনস হল স্বাধীন এবং সার্বভৌম।

স্পেন নেই, আমেরিকা নেই, কিন্তু আগেই বলেছি, ফিলিপিনসের সর্বাঙ্গে ওই দুটি দেশের ছাপ। প্রাচ্যের শ্যামলিমা নিয়েও সে পাশ্চাত্যের অঙ্কশিশু। সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভূখণ্ডের মধ্যে ফিলিপিনসই একমাত্র খৃস্টান দেশ এবং যেখানে সরকারী ভাষা ইংরেজী। এডুয়ার্ডো আনতোনিয়, রোমানা, আমাদোর

ইত্যাদি তার নামে। একটি চাষী অন্য চাষীর সঙ্গে লাঙল চালাতে চালাতে ভাব বিনিময় করে ইংরেজীতে। গায়ে তুলে নিয়েছে প্যান্ট, বুশ-শার্ট, কেনাকাটা করতে যায় সুপারমার্কেটে এবং ডাইনিং টেবিল সোফাসেটি না হলে তার চলে না। তবে আনারসের পাতার আঁশ দিয়ে তৈরী পুরুষদের স্বদেশী পোশাক 'বারং' কিংবা মেয়েদের 'কামিজ-সায়ার' স্থপতি পুরোপুরি জাদুঘরে অবিশ্যি নেই তাদের কদাচিৎ কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যায়। আর স্থানীয় প্রধান ভাষা 'তাগালোগ' সংবাদপত্র, সিনেমা ও বিদ্যালয়ে পরিত্যক্ত না হলেও সর্বক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষারই প্রাধান্য। ফিলিপিনস তাই প্রাচ্য ভূখণ্ডের হয়েও পাশ্চাত্যের। সেখানকার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু আর ভূপ্রকৃতি দেখে আমরা তাকে যতটা আপন মনে করব একজন পাশ্চাত্যবাসী তাকে বেশি আপনার মনে করবে।

সমুদ্র-মেখলা হংকংয়ের মাটি ছেড়ে জেটবিমানের জানালায় দক্ষিণ চীন সাগরে আগুনে-সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ম্যানিলা ইনটারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যখন নামলাম লাউনজের দোরগোড়ায় জনৈক ফিলিপিনো সুন্দরী 'আগ-মারকা' হাসির লেবেল মুখে এঁটে দাঁড়িয়ে। মুখে স্বাগত ভাষণ 'মাবুহোয়'। ইংরেজি ভাষা নিলেও স্থানীয় 'তাগালোগ' ভাষার এই সম্বোধন ফিলিপিনোরা বরবাদ করেনি। স্বাগত ও বিদায়—দুই ব্যাপারেই এই 'মাবুহোয়' চলে। চলে সকলের মুখে মুখে। উঠতে বসতে আসতে যেতে সর্বক্ষণ সর্বত্র 'মাবুহোয়'।

মেয়েটির হাতে বেলফুলের মালা। 'বেলফুলের মালা? এ কোথায় পেলেন?' 'কেন, কেন, কেন, এ যে আমাদের ন্যাশনাল ফ্লাওয়ার শাম্পাগুইতা। চেনেন নাকি এ ফুল?' 'চিনি মানে। এই ফুলের গন্ধে চমক লেগে কতবার উঠেছে মন মেতে। এ যে আমাদের বড় প্রিয় ফুল মল্লিকা, আদর করে বলি-বেলি। আমাদের দেশের মেয়েরা খোঁপায় পরে, সন্ধে হলে কলকাতার গলিতে প্রিয়জন দরশনে উন্মুখ মেয়েদের কানের কাছে এসে ফুলওয়ালা ডাকে-'চাই বেলফুল।' এমন মনমাতানো গন্ধ আর কে বিলায়?'—'ঠিক বলেছেন। এই-

জন্যেই তো এ আমাদের জাতীয় ফুল—প্রেম, যৌবন আর বন্ধুত্বের প্রতীক। এই ফুল কোন তরুণের হাত থেকে কোন তরুণী গ্রহণ করলে বুঝতে হবে তরুণের প্রেমের আহ্বান ব্যর্থ হয়নি, সে তার দয়িতার কাছে গ্রাহ্য।'

শুধু কি বেলফুল। পরদিন ভোরে ম্যানিলার অভিজাতপল্লী মাবিনার রাস্তা ধরে যখন হারবারের দিকে হেঁটে বেড়িয়েছি, দেখেছি জবা, কাঠগোলাপ ইত্যাদি আমাদের দেশী ফুলে সারা শহর ভরতি। গ্রামে আমকাঁঠালের গাছ, আর শহরে বেল আর জবা—এমন দেশটি কোন বাঙালীর ভাল না লাগে!

ফিলিপিনসে আমার আমন্ত্রণ-কর্তা প্রেস ফাউনডেশন অব এশিয়া এবং ফিলিপিনস প্রেস ইনস্টিটিউট। প্রেস ফাউনডেশনের দুই কর্মকর্তাই আমার পূর্ব পরিচিত। একজন টারজি ভিটাচি, সিংহলী, নামকরা সাংবাদিক। দ্বিতীয়জন আমার সমনামী এবং আকৈশোর বন্ধু শ্রীনিরপেক্ষ অমিতাভ চৌধুরী। অমিতাভ তাঁর শিশু পুত্র নীল আর শিল্পী-সহধর্মিণী নীপাকে নিয়ে দীর্ঘকাল এখানে আছে। আছে বঙ্গদেশী পতাকা সগৌরবে উচ্চে তুলে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংবাদপত্র জগতে তাঁর অসীম সমাদর, ম্যানিলায় সে একজন কেষ্টবিষ্টু। এই সম্মান সে পেয়েছে তাঁর সংগঠন ক্ষমতা আর সাংবাদিকতার স্বীকৃতিতে। ম্যানিলায় এসে সরকারী ও বেসরকারী মহলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখে আনন্দের সঙ্গে মনে মনে বলেছি, আমি সত্যি সত্যিই পরনামধন্য।

অবশ্য আমাদের দুজনের নাম নিয়ে গত পঁচিশ বছর যে বিভ্রান্তি চলেছে, তার জের ম্যানিলায় এসে আরও বেড়েছে। যুগান্তরের সাংবাদিক বন্ধু নিরঞ্জন সেনগুপ্ত আমার সঙ্গে না থাকলে কদাচিৎ-বাঙালী-দেখা ফিলিপিনোরা হয়ত ধরেই নিত বঙ্গভাষী মাত্রেরই নাম অমিতাভ চৌধুরী।

নাম নিয়ে দেশেই কি আমাদের কম ঝামেলা হয়েছে! ও ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেলে আমার কাছে অভিনন্দন বার্তা এসেছে।

বিশ্বভারতীর কর্মসমিতিতে আমি নির্বাচিত হলে ওর কাছে টেলিফোন গিয়েছে। আমার লেখা কোথাও ছাপা হলে প্রশংসা বা নিন্দা ওর কপালে জুটেছে। ওর বিয়ের খবর পেয়ে আমার বাড়িতে লোক এসে হাজির হয়েছে। সমবয়সী, সহপাঠী ও সমনামী হওয়ার যে কী বিপদ তার পরিচয় আরও পেয়েছি স্নাতকোত্তর ক্লাশে পড়ার সময় কলকাতায় একই বাড়িতে থাকতে থাকতে। খামের চিঠি, বিশেষ করে তা যদি নীলরঙের হয়, তাহলে তা কে খুলবে তা নিয়েও কম ঝকমারি পোহাতে হয়নি আমাদের।

সেই ঝকমারি তাড়া করল দূর ফিলিপিনসেও। এসেছি ম্যানিলা থেকে মাইল চল্লিশ দূর লাসবানোস-এ, কৃষি প্রতিবেদন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে। দুজনেই একই চক্রে উপস্থিত। দুজনেই ঘুরি একসঙ্গে। 'মিসটার চৌধুরী' বলে সম্বোধন করলে সাড়া দিতে হয় একসঙ্গে। এক ডাকের দুই সাড়ায় বিস্মিত হন।—'ইজ দ্যাট সো? হাউ স্ট্রেনজ!' ইত্যাদি নানা রকম আশ্চর্য-বোধক মন্তব্য শুনে শুনে আমাদের দুজনের মজা আরও বেড়ে যায়। শেষের কদিন ছিলাম ওর বাড়িতে—যে বাড়ি শ্রীমতী নীপার শিল্পনৈপুণ্য ও অতুলনীয় গৃহিণীপনার দৌলতে ম্যানিলায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের আবাস হওয়ার যোগ্য।

সেখানেও সমস্যা। প্রতি সন্ধ্যায় সমাগত অতিথি ও বাড়ির গৃহকর্মিণীর দল জলজ্যান্ত দুই অমিতাভ চৌধুরীকে এক বাড়িতে দেখে হতবাক। আর বন্ধুবরের পূর্বপরিচিত ও আমার নতুন পরিচিত কোন ফিলিপিনোর ফোন এলে তো কথাই নেই, নামবিভ্রাটে প্রায় ভূপতিত ফোনের অপর প্রান্তের ভদ্রলোকটি প্রায়ই হতবুদ্ধি হয়ে লাইন ছেড়ে দিয়েছেন।

অমিতাভ ও নীপা সঙ্গী থাকায় ফিলিপিনস, বিশেষ করে লুজন দ্বীপের নানা জায়গা ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ সহজেই আমার হয়েছিল। কোনদিন গিয়েছি ইউনিভারসিটি অব ফিলিপিনসের অত্যাশ্চর্য সুন্দর ও অতিকায় ক্যামপাসে, কোনদিন গিয়েছি এক

আগ্নেয়গিরির প্রান্তদেশে তাগাইতাই-এর মনোরম ভোজনশালায় ( সেখানেই হঠাৎ দেখা রাষ্ট্র-অতিথি, তখন আমাদের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিদায়েতুল্লা সাহেবের সঙ্গে ), কখনও বা ঘুরেছি খোদ ম্যানিলার এপাশে ওপাশে। দেখেছি পাসিগ নদীর পারে বৃহৎ শপিং সেণ্টার এসকোলটা, ফিলিপিনো কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটোল, প্রেসিডেণ্টের বাসভবন মালাকানং, ফোর্ট সানটিয়াগো। ঝকঝকে তকতকে ছবির মতন শহর, সমুদ্রের পার ঘেঁষে ঘেঁষে সুরম্য অট্টালিকার সারি, দিনে সূর্যের আলোয় ঝকঝক, রাত্রে রঙীন বিজলিতে ঝলমল। বিরাট চওড়া রাস্তায় রাস্তায় হাল মডেলের গাড়ির স্রোত আর হাসিখুশি ফিলিপিনো তরুণ-তরুণীর দল।

শহরের চেয়েও সুন্দর 'বারিও'—গ্রাম। বাড়ি ঘরদোর যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি পরিচ্ছন্ন সাধারণ লোকের জামাকাপড়। ভিতরে বাইরে এমন পরিষ্কার জাত আমি কদাচিৎ দেখেছি। প্রাতঃস্নান সর্বজনীন, মোষের গাড়ি চালিয়ে যে যাচ্ছে, তার জামাকাপড়ও ধবধবে।

এবং গানবাজনার নামে পাগল ছেলেবুড়ো সবাই। সন্ধে হলেই কেউ ছোটে পানাগারে, কেউ বাড়ির দোরগোড়ায় বসে স্পেনীশ গিটার কিংবা বাঁশের বাদ্যযন্ত্র মুসিকং নিয়ে। হাসির খিল খিল আর বাজনার টুংটাং মিলে এক অনবদ্য অর্কেস্ট্রা বেজে চলে শহরে গ্রামে। আর পিনতাকাসি, অর্থাৎ মুরগির লড়াইয়ের সময় এলে তো কথাই নেই, হাজার হাজার পেসো ( প্রায় দু' টাকার সমান এক পেসো ) বাজি ধরা হয় এক একটি মুরগির পিছনে। সারা তল্লাটে উৎসব শুরু হয়ে যায়। চেনা-অচেনা সামনে যে আসবে তাকেই বলবে তাগালোগ ভাষায় 'মাবুহোয়'—স্বাগত ও বিদায় জানানোর সেই সর্বজনীন সম্ভাষণ।

গ্রামের হাটে একদিকে যেমন বিক্রি হচ্ছে লাউকুমড়ো কচুশাক উচ্ছে আম কাঁঠাল পেঁপে আনারস, তেমনি কোন চাষীর বাড়ি থেকে ঢাউস গাড়ি বেরোলে কিংবা গ্রামের ভিতরেই হালকায়দার কাফেটারিয়া

দেখলে ব্যতিক্রম বলে ধরা যায় না। গরিব যে নেই এমন নেই, ফিলিপিনস স্বর্গরাজ্য এমন কথাও বলিনা, কিন্তু আমাদের দেশের কথা ভাবলে ফিলিপিনসের উজ্জ্বল প্রাণবন্ত জীবন দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারা যায় না। একান্তভাবে কৃষিনির্ভর দেশ, শতকরা আশীভাগ লোক চাষবাস করে। চাল তামাকপাতা নারকেল আম ফলায়, জঙ্গল থেকে কেটে আনে দামী কাঠ, সোনা লোহা রূপা তামা তেল সিমেন্ট কয়লা টিন ক্রোমাইট এসফালট—অল্পবিস্তর সবই মেলে মাটির তলায় এবং তারই দৌলতে হাস্যগীতমুখরিত এক সুখী বর্তমান নিয়ে ফিলিপিনসের লোক মশগুল। জীবনযাত্রার মান বাড়াতে সবাই উদগ্রীব। তাই চলছে আরও পরিশ্রম আরও রোজগারের ফন্দিফিকির।

মার্কিন মুলুকের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অশান্তি, অ-সুখ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যেহেতু দেশটা মূলত প্রাচ্যভূমির, তাই শত অন্তর্জ্বালা সত্ত্বেও প্রাচ্যসুলভ প্রশান্তি মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। কিছুদিন থাকলেই বোঝা যায় মারকিনীদের অনুকরণে আগ্রহী ফিলিপিনোরা ধীরে ধীরে নিজের অতীত আর ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিলেও আধুনিক বিশ্বের দরবারে নিজেকে আরও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সর্বতোভাবে পণবদ্ধ হয়েছে। শতকরা আশীজন লোক আজ সেখানে শিক্ষিত, এক ম্যানিলার চারপাশেই বারোটা বিশ্ববিদ্যালয়। তার মধ্যে একটি হারভার্ডের চেয়ে পঁচিশ বছরের পুরানো। এশিয়ান ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংকের সদর দপ্তর ম্যানিলায়। ম্যানিলাতেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সীয়াটোর। ম্যানিলার অনতিদূরে ইনটারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট—যেখানে গবেষণারত রয়েছেন ভারত সমেত আট ন'টি দেশের নামী কৃষিবিজ্ঞানী। ওখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যুগান্তকারী অবাক ধান 'আই আর এইট।' ফিলিপিনস জোট-ছুট নয়, সে মার্কিন রাজনীতির সঙ্গে টিকি বাঁধা, কিন্তু জীবনযাত্রায় মার্কিন দেশের অনুকরণ করলেও দেশের উঠতি যুবসমাজ তাদের সরকারকে সর্ববিষয়ে ওয়াশিংটনের

প্রতিধ্বনি করতে দিতে নারাজ। রুজভেল্ট বা কেনেডি নয়, তাঁদের ন্যাশনাল হীরো রিজাল-এর নাম নিয়েই তাঁরা শপথ নেয়। রিজাল পার্ক, রিজাল অ্যাভিনিউ ইত্যাদি নাম দিয়ে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ককে অবিরাম স্মরণ করে।

তবে স্বীকার করতেই হবে, ফিলিপিনস নৈশজীবনের ক্ষেত্রে খাস আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। ম্যানিলার নাইট ক্লাবের কাছে নিউ ইয়র্ক, লস এনজেলস, প্যারিস হামবুর্গের নাইট ক্লাব নিরামিষ। যে কোন ছোট শহরে গেলেই গোটা তিন চার নাইট ক্লাবের সাক্ষাৎ মিলবে। আর ম্যানিলাতে তো কথাই নয়, প্রতি পাড়ায় প্রতি পথে নাইট ক্লাব আর নাইট ক্লাব। তাছাড়া সমুদ্রের ধার ঘেঁষা বুলেভারদের পার ধরে মাইলের পর মাইল চলেছে নাইট ক্লাবের সারি। সংখ্যা দেখে মনে হয় যেন সারা ফিলিপিনস বারো মাস নিশিবাসর জাগে। এক একটি ক্লাবের ভিতরে শতাধিক উর্বশীর নাচগান, হল্লার হুল্লোড়। লিডো কিংবা মুলাঁরুজের মত বাজনার তালে তালে নির্মোক-নৃত্যের বালাই নেই, পূর্ণ বিবসনার দল সেখানে স্বচ্ছন্দচিত্তে ইতস্তত বিচরণ করেন অতিকায় হলঘরের টেবিলে টেবিলে ঘুরে। বামা-খ্যাপা এই শহরের বনেদী হোটেলে পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রা দেওয়া অসম্ভব। হোটেলের বেলবয় থেকে শুরু করে রিসেপশনিস্ট পর্যন্ত অতিথির খিদমদগারে এমন লেগে যাবে যে, বার বার মানা সত্ত্বেও প্রতি আধঘণ্টা অন্তর শোবার ঘরের দরজায় কোমল অঙ্গুলীর টোকা পড়বেই।

সমনামী বন্ধুবরের প্রতিবেশী এলবার্ট র‍্যাবেনহোল্ট বিদগ্ধ রসিক ব্যক্তি। তাঁর পরিচিত হওয়া আমার উপরি-পাওনা। র‍্যাবেন-হোল্ট-দম্পতির মত এমন সজ্জন ও সর্ববিষয়ে আগ্রহী পরিবার কদাচিৎ মেলে। কুয়ালালামপুরে দারুচিনির চাষ, আলী আকবরের সরোদ, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট, সিন্ধু উপত্যকার মহেনজো-দারো সভ্যতা, প্রাচীন চীনের সেচব্যবস্থা—কোন বিষয়ে যে এলবার্ট অথরিটি নন, অল্প পরিচয়ে ঠাহর করতে পারিনি। তাঁরই প্ররোচনায়

এবং আমার বন্ধুটির পৃষ্ঠপোষকতায় ম্যানিলার একটি অভিজাত নাইট ক্লাব দর্শনের 'সৌভাগ্য' ( নাকি দুর্ভাগ্য ? ) আমার ও নিরঞ্জন সেন-গুপ্তের হয়েছিল। সেখানে কাণ্ডকারখানা দেখে দুজনেরই যুগপৎ মস্তকঘূর্ণন ও বিবমিষা।

নাইট ক্লাবটির বাইরে এসে নিরঞ্জন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন —ম্যানিলা নামটা ভুল, শহরটার নাম হওয়া উচিত 'উয়োম্যানিলা !'

সত্যিই তাই 'ম্যানিলা' নয়, 'উয়োম্যানিলা।'

চুলোয় যাক নাইট ক্লাব, তার চেয়ে বন্ধুগৃহে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে রাত-নিঝঝুম ঘরের ভিতর 'মায়ার খেলা' নাটকের মায়া-কুমারীদের গান শোনা ঢের ঢের ভালো। আর তার সঙ্গে যদি বন্ধুপত্নীর নিজের হাতের তৈরী রসগোল্লা থাকে, তাহলে হোক না দূর প্রবাস, মনে হবে কলকাতাতেই আমাদের কোন বাড়িতে জেগে আছি। সেই কলকাতা যেখানে আলোর তেজ কম, রাস্তাঘাটে গর্তের বিভীষিকা, অনাদরে অবহেলায় সে মৃতপ্রায়। সেই কলকাতা—রবীন্দ্র-সংগীত ও রসগোল্লার মত প্রত্যেক বাঙালী যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। অতএব বিদায় ম্যানিলা—'মাবুহোয়'।

## দুশমন টেলিভিশন

নামেই পাড়াগাঁ, কিন্তু আধুনিক কেতায় আমাদের যে কোন শহরের চেয়ে বাড়া। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বাড়িঘর সবই ঝক-ঝকে। আর যে হোটেলে আমার দুদিনের আস্তানা, তার বিলাস-দেখলে চোখ টাটায়।

১৯১২ সাল। মিউনিক থেকে ট্রেনে এসেছি হোফ্। হোফ্ থেকে রেহাউ হয়ে জেলব্—পূর্ব জার্মানি আর চেকোশ্লোভাকিয়ার কোল ঘেঁষে ছোট্ট একটা জায়গা। জেল্বের নামডাক তার পোর্সেলিন শিল্পের জন্য। গোটা এলাকার অন্নবস্ত্রের সম্বল কয়েকটি পোর্সে-লিনের কারখানা। তার মধ্যে বিশ্বজোড়া খ্যাতির কোম্পানি রোজেনথাল এবং হাইনরিষ।

ভেবেছিলুম মিউনিকের হোটেল কাইজারের আরামের কাছে জেল্বের পার্ক হোটেল হবে হেলাফেলার। কিন্তু পা দিয়েই ভুল ভাঙল। মিউনিকের হোটেলের মত এত বড় নয় বটে, তবু বলতে দ্বিধা নেই, পার্ক হোটেলের সাজানো ঘরদোর আর ২০৯ নম্বর ঘরের ভেতর দামী আসবার দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ।

সকাল বিকাল ঘুরলুম চেক আর পূর্ব জার্মানির সীমান্ত। সঙ্গে ছিলেন বাভারিয়ার বর্ডার পুলিশের বড় কর্তা হের কোলব্। কখনও এগার নদী পেরিয়ে এগারো কিলোমিটার দূর হোহেনবার্গ, কখনও সালে নদীর পারে ম্যডলার্থ। বিজলি-তারের সচল কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়ার সাহস নেই—যদি গুলি ছোঁড়ে! বাইনাকুলার লাগিয়ে শুধু দেখতুম, ওপারের কম্যুনিস্ট এলাকায় সীমান্ত পুলিস কী করছে।

চক্কর মেরে মেরে ক্লান্ত। সন্ধেবেলা সেদিন আড্ডা জমাচ্ছি পার্ক-হোটেলের রেস্তোঁরায়। ইতালিয়ান বয়টি জার্মান ছুঁড়ির সঙ্গে আশনাই

মেরে আমাদের টেবিলে খাবার জোগাচ্ছে। গাইড পিটার ভিল চোঁ চোঁ করে সাবাড় করলে তিন বোতল বীয়ার। আমি আঙুরের রস ট্রাউবেনজাফ্টের গেলাস হাতে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি।

এমন সময় নেংচে নেংচে এল এক বুড়ো। এদিক ওদিক 'বাও' করে বসে পড়ল আমাদের টেবিলেরই এক চেয়ারে। ভিল এবং আমি ছুজনেই অপ্রস্তুত।

বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। ঝাপসা কাচের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, ওভারকোট মুড়ি দেওয়া তরুণ তরুণী রেস্তোরাঁর গায়েলাগা ফুটপাত দিয়ে আসছে, চলে যাচ্ছে।

বুড়ো ডান ভুরুটা উপর থেকে নীচ নামিয়ে ভিলকে বললে—"কোথেকে আসা হচ্ছে?"

—"মিউনিক।"

—"মিউনিক? চমৎকার জায়গা"—বুড়ো টাকরায় জিব লাগিয়ে চুক-চুক আওয়াজ করে বলে চলল—"আমিও ছিলুম সেখানে। শ্বাবিং-এর ক্যাবারেতে ক্ল্যারিওনেট বাজাতুম। মিউনিকের মেয়ের তুলনা নেই। গটমট করে চলে, আসতে যেতে চোখের ছুরি মারে; আর ছু' বোতল শ্যাম্পেন জোগাতে পারলে কথাই নেই, একেবারে ঢলে—"

বুড়ো কথা শেষ করল না। অতীত স্মৃতির আবেশে ছু'চোখ বুঁজে বসে রইল। ভিল কানে কানে আমাকে বললে—"ভ্যালা বিপদে পড়েছি, বুড়োর অটোবায়োগ্রাফি কে শুনতে চাইছে?"

মিনিট ছুই পর চোখ খুলে আবার বললে—"অনেক দিন পড়ে আছি জেল্‌বে। পচা শহর। মেয়েগুলো কাঠখোট্টা নীরস। সেদিন ইসারায় ডাকলুম একটিকে। এলই না, কটমট তাকিয়ে হুট করে চলে গেল।"

আর শুনতে ভাল লাগছিল না। আমরা ছুজন টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লুম। বুড়োকে বললুম—"তাড়া আছে, মাফ করতে হবে।"

তাড়া সত্যিই ছিল। খানিক পরে আসবেন যোসেফ মিংগেল।

হাইনরিখ পোর্সেলিন কারখানার পি-আর-ও, হের কোলব্ এবং জেলবের বুর্গোমাস্টার অর্থাৎ মেয়র। আমি এবং আমার সঙ্গী আরও তিনজন ভারতীয় সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য, শান্তিকুমার মিত্র এবং মনোমোহন মিশ্রকে এই হোটেলেই ডিনারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন মেয়র। একখুনি তৈরি হয়ে আমাকে আসতে হবে।

ডিনার টেবিলে বসে আবার সেই পুরাতন সমস্যা। কী অর্ডার দিই? জার্মান রান্নায় বিতৃষ্ণা গত কদিনই ধরে গেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির একমাত্র সম্বল ফ্রায়েড চিকেন। তা'ও সব সময় খাওয়া যায় না। চিকেনগুলো এত শক্ত যে মনে হয় বিসমার্কের সময় থেকে ফ্রিজে রাখা আছে।

লাল মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে মিংগেল বললেন—"বলুন, কেমন লাগছে আমাদের দেশ?"

"চমৎকার, তাছাড়া আপনাদের আতিথেয়তার ঠেলায় প্রাণ যায়" —আমি জবাব দিই।

'আতিথেয়তা' থেকে কথার মোড় ঘুরল ভারতের রাজনীতিতে। রাজনীতি থেকে কৃষ্ণমেনন। মেনন থেকে কম্যুনিজম। কম্যুনিজম থেকে পশ্চিম জার্মানির হালফিল অবস্থা।

কম্যুনিজমের প্রসঙ্গে অনিল ভট্টাচার্য আর মিংগেল জোর তর্ক। মিংগেল বলেন, "কম্যুনিজম কী ভয়ানক জিনিস, আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। তাই ওই দল আমাদের দেশে নিষিদ্ধ। আপনাদের দেশেও তাই করছেন না কেন?"

অনিল ভট্টাচার্য চটপট জবাব দেন—"তা কেন? নিষিদ্ধ করলে পার্টি আরো জোরদার হবে। আমরা ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক রীতিতে কম্যুনিজম উচ্ছেদ করব।"

কোল্‌ব ফোঁড়ন কাটেন—"গণতন্ত্র যারা বোঝে না, সেই দলকে গণতন্ত্রে টেনে আনা কেন।"

ভিল সঙ্গে জুড়ে দেয়—"পরে বিপদে পড়বে ভারতবাসীরা-ই। এখনই সমূলে নাশ করা উচিত কম্যুনিস্ট পার্টিকে।"

অনিল ভট্টাচার্য নাছোড়বান্দা। গলা সপ্তমে চড়িয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের জয়গান শুরু করে দিয়েছেন। এমন সময় হোটেলের আর একটা ঘরে পিয়ানোর সুরেলা আওয়াজ। নিমেষে আমার মন অন্য দিকে চলে গেল।

রেস্তোরাঁর গায়ে-লাগা ছোট্ট লাউঞ্জ। তারই পুব-উত্তর কোণে আর একটি ঘর। আওয়াজ ওই ঘর থেকেই আসছে।

কম্যুনিজম থেকে আলোচনা আবার মোড় ঘুরেছে রাউরকেলা ইস্পাত কারখানায়। আমি নীরব শ্রোতা। এবং তকখুনি পিয়ানোর টুংটাংয়ের সঙ্গে কয়েকটি মেয়ের খিলখিল হাসির আওয়াজ।

কী হচ্ছে ওই ঘরে? ধুৎতেরি, আমরা এমন নীরস আলোচনায় সময় কাবার করছি, আর ওদিকে পাশের ঘরে ফুর্তি চলছে।

কোল্‌ব্‌ বললেন—"হের শাউডুরি, আপনি চুপচাপ যে, আপনার জন্যে 'লিকিওর' কী 'ওর্ডার দেব?"

খানা ততক্ষণ শেষ এবং এই সারগর্ভ আলোচনাও আহারান্তিক। আমি স্রেফ এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বললুম—"আপনাদের কথা শুনছি, সবাই কথা বললে চলবে কেন। শোনার লোকও তো চাই।"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সেই ঘরে থেকে আর এক দফা হাসির আওয়াজ। কণ্ঠ কয়েকজন তরুণ তরুণীর। তার সঙ্গে পিয়ানোর পিড়িং পিড়িং আর ডিকেন্টাবের টুংটাং আওয়াজ তো আছেই।

ওই ঘরে কারা? কারা আড্ডা জমিয়েছে এই রাত বারটায়? নিশ্চয়ই আসর বসেছে আনন্দের। জড় হয়েছেন জেল্‌বে্‌র বাছাই করা সুন্দরীরা। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এখন চলছে মধ্যরাত্রির আমোদ প্রমোদ।

দূর ছাই, এদিকে সব ফেলে আমরা যত সব আজেবাজে বকবক শুনছি এবং বুর্গোমাস্টারের টেকো মাথা আর কোল্‌বের নোংরা ঝাঁটা-গোঁফ নিরীক্ষণ করেই এমন সুন্দর রাতটা মাটি করছি।

রাউরকেলা ছেড়ে আলোচনা পৌঁছেছে হিটলার প্রসঙ্গে। ফুয়েরারের কুকীর্তি জার্মান জাতির কতখানি সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।

তাই নিয়ে টেবিলের এপারে ওপারে বাক্যের তুফান ছোটাচ্ছে। ঠিক তখুনই ওই রহস্যময় ঘরে গোটা দশ বারোটি বেহালার মূর্ছনা। সঙ্গে আরো কয়েক রকমের বিলিতি বাজনা। এবং সেই আর্কেস্ট্রার তালে তালে লাস্যময়ীদের নপুর নিক্কণ। হায় ভগবান, আমাকে কেন এই খানাঘরে বন্দী করে রাখলে।

একবার ভাবলুম টেবিল ছেড়ে উঠে যাই, এক ফাঁকে দেখে আসি ওই ঘরের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু সাহস হল না, টেবিল ছাড়লে অভদ্রতা হবে যে।

এদিকে রাত্ একটা, সঙ্গী শান্তি মিত্র হাই তুলছেন। মিশ্র মশাইয়ের চোখও ঢুলু ঢুলু। শুধু অনিল ভট্টাচার্য জোর তর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। আপাতত আলোচ্য দ্বিধাবিভক্ত বার্লিন।

ওদিকে তখনও বাজনার, হাসির আর নাচের আওয়াজ—গোটা ঘর জমজমাট। রাত যত বাড়ছে ফুর্তিও যেন তত বাড়তির দিকে।

হোস্টদের উপর বিষম রাগ হল। কী দরকার ছিল এত রাত পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখার? খাইয়ে দাইয়ে ছেড়ে দিলেই তো পারতো! আর তেমন যদি আড্ডা মারার দরকার থাকে, চল না বাবা ওই নাচঘরে গিয়েই সবাই বসি। কয়েক গজ দূরে মচ্ছব চলছে, আর আমরা বসে বসে রাজনীতির তর্ক চালাব? এ কেমন কথা।

আমার আর ধৈর্য রইল না। 'টয়লেট' যাবার নাম করে উঠে পড়লুম। যা থাকে বরাতে, ওই নাচঘরে এবার ঢুকে পড়ব। কানের কাছে এমন আওয়াজ আসবে, আর চুপ করে বসে থাকব কোন বেয়াকুবিতে? আমিও তো এই হোটেলের পয়সাদেনেওলা মুসাফির।

এদিক ওদিক তাকিয়ে সেই ঘরের দিকে এগোলুম। বাজনা আরো জোরদার, মেয়েদের হাসির আওয়াজ আরও মধু-ঢালা। আমি টাইটা ঠিক করে নিলুম। মনে মনে ভাবলুম, সঙ্গীরা মরুক ওই টেবিলে বসে, আমি আর যাচ্ছিনে খাবার টেবিলে।

ঘরের পর্দা সরাতেই চিচিং ফাঁক। অন্ধকার ঘর। ঘরে লোকজন নেই। শুধু এক কোণে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন দুই বুড়োবুড়ি। আর অন্ধকারের মাঝখানে জ্বলছে সব আওয়াজের আধার একটি অতিকায় টেলিভিশন সেট।

এমন অ্যান্টি ক্লাইমেক্স আমার জীবনে আর ঘটেনি। ফের গুটিগুটি খাবার টেবিলে গিয়ে বসলুম। আলোচনা তখন বার্লিন থেকে গোয়া।

## খিচুড় আড্ডা

কার ল্যাণ্ডলেডি কত খাণ্ডার, কত ছিটেল,—তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ভোরবেলা জোরে হাঁচি দেওয়ার জন্যে কাকে বাড়ি বদল করতে হয়েছে, মেয়ে বন্ধুর বেশি চিঠি আসার অপরাধে কে বাড়িছাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক রকম ট্র্যাজিক কাহিনী আড্ডাটি বিষাদ মন্থর করে তুলেছে।

এমন সময় সান্যাল বললে 'আমার ল্যাণ্ডলেডি ভাই বেশ দিলদরিয়া ছিল। জুতো সাফ করে দিত, শার্ট ইস্ত্রি করত, ব্রেকফাস্ট ডিনারেও ডাক দিত। কিন্তু আমার একটি মাত্র মন্তব্যে সব গুবলেট হয়ে গেল, চার ঘণ্টার নোটিশে আমি আবার একদিন প্রশস্ত রাজপথে। ভাগ্যিস ব্যানার্জি ছিল পাশের বাড়িতে, নইলে জানি না কোথায় গিয়ে উঠতুম তখন।'

আমরা সবাই রসের সন্ধান পেলুম। ঘোষের কাছে শুনেছিলুম, সান্যালের সেই ল্যাণ্ডলেডি ছিলেন খাপসুরৎ ভদ্রমহিলা। বয়স? তা বলা মুশকিল, দেখতে তিরিশ বত্রিশ এবং সাজগোছের বাহার আহা-মরি গোছের। ছুরিতে ফুলকপি টুকরো করতে করতে বনানী জানতে চাইলে আসল ব্যাপারখানা কী?

'ছোট্ট একটা কথা,—সান্যাল আর একটি সিগারেট ধরিয়ে বলে, —'সেদিন মেমসাহেব সেজেগুজে বেরোচ্ছেন, দোরগোড়ায় আমার সঙ্গে দেখা। বললেন, সানিয়াল কেমন লাগছে আমাকে? আমি বললুম—চমৎকার, সঙ্গী হবার সাধ জাগছে।'

'আর আমার এই নেকলেসের লকেটটা?'—মেমসাহেব তারিফের আশায় তাকিয়ে রইলেন।

চেয়ে দেখি, এরোপ্লেনের ডিজাইনে তৈরী ছোট্ট একখানা লকেট, ধবধবে আধখোলা বুকের ওপর ঘাপটি মেরে লেপটে বসে আছে।

ফস করে মুখ থেকে বেরিয়েগেল—'বুঝলেন ফ্রাউ হাকের, এরোপ্লেনটা নয়, আমি রানওয়েটা দেখছি। বিউটিফুল।'

আর যায় কোথা, ভদ্রমহিলা কটকট তাকিয়ে গটমট বেরিয়ে গেলেন। পরদিন ভোরবেলা ছোট্ট চিরকুট : অবিলম্বে ঘর খালি করতে হবে।

বনানী খিচুড়ির ডেকচি বিজলী উনুন থেকে নামিয়ে বলে—'ঠিক হয়েছে, অমন যা' তা' মন্তব্য করতে যান কেন, ধরে চাঁটি যে লাগায় নি, তাই ভাগ্যি অনেক।'

ফাইফরমাশ খেটে হয়রান মনোজ চৌধুরী তখন আরও পাঁচ প্যাকেট সিগারেট কিনে এনে সবে মাত্র ঘরে ঢুকেছে। আলোচ্য বিষয় ল্যাণ্ডলেডি শুনে বললে, 'আমার অবস্থাই সবচেয়ে কাহিল।'

রায়চৌধুরী ফোড়ণ কাটে,—'তা হবেই তো, যা ক্যাবলাকান্ত তুমি।'

ভালো মানুষ মনোজ ওসব গায়ে মাখে না। বলে, 'আমার ল্যাণ্ডলেডিটি হাড় বজ্জাত, উঠতে বসতে জ্বালিয়ে মারছে। ইদানীং হয়েছে নতুন বিপদ, ওই বাহাত্তুরে বুড়ির সঙ্গে হর শনিবার আমায় সিনেমা যেতে হচ্ছে। কারখানার অল্পবয়সী মেয়েরা টিটকারি দেয়, কিন্তু কী আর করি, বিধবা-বুড়ি এই ল্যাণ্ডলেডির মন জোগাতে হবেই। আছি অজ পাড়াগাঁয়ে, অন্য বাড়ি পাওয়াই মুশকিল।'

মনোজের দুর্দশার কথা শুনে আমাদের কোরাস হাসি। ছোট্ট রান্নাঘর খিলখিল করে উঠল। গৃহকর্তা প্রবীর ঘোষ চটপট জানালা বন্ধ করে দিলে। বললে, 'নিচে আমার ল্যাণ্ডলেডি ফ্রাউ মুলার আছেন, চেঁচামেচি শুনলে ছুটির দিনে এমন আড্ডা আর বসাতে পারব না।'

হ্যাঁ, আড্ডার মত আড্ডা বটে! এবং কোথায়?—সুইজারল্যাণ্ডের এক ছবির মত শহরে। জুরিখের কাছে আরাউ। তারই গায়ে লাগা ছোট শহর বুখ্‌স্। তদধিক ছোট রাস্তা ফেরেনাভেগের এক বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির দোতালায় রবিবারের সকাল জম-

জমাট হয়ে আছে। চারপাশ থেকে ঝেঁটিয়ে এসেছে প্রবাসী বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের দল।

প্রায় রবিবারেই ওরা আসে। তার কারণ ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর ঘোষ এদেশে সস্ত্রীক। ঘোষ-দম্পতির বাড়িতে এলে বাঙালী রান্নার স্বাদ পাওয়া যায়। বাড়তি আকর্ষণ ঘোষ-জায়া বনানীর খাসা গলা। সে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন জাঁদরেল গাইয়ে।

আমিও গত কয়দিন ধরে ঘোষ দম্পতির অতিথি। এদেশে ওদেশে ঘোড়-দৌড়ের পর এখানে একটানা বিশ্রাম। দু-ভাঁজ করা ধুতিতে বানানো লুঙ্গি পরে, বেডকভার গায়ে দিয়ে বাড়িতেই শুয়ে বসে দিন কাটাই, বনানীর হাতে তৈরী ভাত, মুগের ডাল, মাছের ঝোল খাই, এবং অফিস থেকে প্রবীর এলে তিনজনে বিকেলে বেড়াতে বেরোই। দূরে পাহাড়, কাছে অথৈ জলের লেক, চেরী আর ফার গাছের ভিড়। কখনও আকাশ ফর্সা, ঘন নীল। কখনও ঝমর ঝমর বৃষ্টি।

আরাউ রেলস্টেশন ছাড়িয়ে আমরা একদিন ছুটি ঐ দূরের পাহাড়ের কোলে, একদিন যাই লেকের জলে নৌকো ভাসাতে। অষ্টপ্রহর দেশের কথা, কলকাতার কথা, ফাঁকে ফাঁকে বনানী হঠাৎ গান ধরে—'তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয়-মাঝে, শরৎ-শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে।'

আবার কোনদিন দোতলা বাড়ির বারান্দায় বসে রোদ পোহাই। সামনে আঙুরলতার ঝাড়। দেয়াল বেয়ে বেয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারতে চাইছে। অলস ঔদাস্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই। রান্নাঘর থেকে কাচের বাসনের, প্লেটের টুংটাং শব্দ আসে আর আসে দু' একটি গানের কলি—'দিনান্তের এই এক কোণাতে, সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে, মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ।'

শনি রবি এলেই বাড়ির অন্য চেহারা। ল্যাণ্ডলেডি আর মেয়ে বন্ধুর খপ্পর থেকে নিজেদের উদ্ধার করে কাছে পিঠে কাজ করা বাঙালী ছোকরাদের দল আসে এবং সারাদিন, সারারাত নরক গুলজার। আড্ডার কেন্দ্রস্থল এই রান্নাঘর।
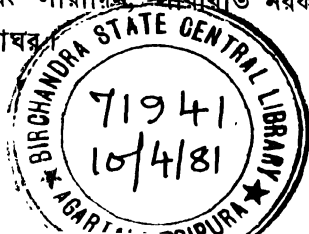
বনানী খিচুড়ির ডেকচি নামিয়ে ডিমের ওমলেট ভাজতে হাত দিয়েছে। জানালায় পিঠ দিয়ে একমনে সিগারেট ফুঁকছে মিত্তির।

বাডেনের সেনগুপ্ত টেবিলের ওপরে দু-হাঁটু মুড়ে। রায়চৌধুরী দুষ্টুমির হাসি হাসছে সর্বক্ষণ। সান্যাল আর একটি চেয়ার নিয়ে। মনোজ আছে বনানীর জোগানদার হয়ে। ব্যস্তবাগীশ প্রবীর ছটফটি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। এবং সেই আসরেই শ্রীযুক্ত আমি খিচুড়ির প্রত্যাশায় জিবে শান দিয়ে চলেছি অনেকক্ষণ।

প্রবীর বললে—'কার্তোপেল স্যালাড আর পাসতেৎলি বানালে কেমন হয়?'

আমি আপত্তি জানালুম। বললুম, 'আজ্ঞে না, নামের বাহার দেখে আমি ভুলছিনে। জার্মানি ইংল্যাণ্ডে খাবারের মেন্যু দেখে অনেক ঠকেছি, আর নয়।'

'কেন, কেন'—প্রবীর বলে—'চমৎকার পাসতেৎলি আর কার্তো-পেল—'

'ঝাড়ু মারি পাসতেৎলির কপালে',—আমার চড়া গলা,—'দেড় বছর এদেশে থেকে তুমি না হয় সুইস বনে গেছ, কিন্তু আমার সব জানা আছে ভায়া। কার্তোপেল মানে তো আলু, তার সঙ্গে না হয় অন্নপ্রাশনের ভাত উগরে আসার পক্ষে যথেষ্ট কোন জুস টুস মেশাবে এবং ওই জিনিস পাতে দিয়ে খিচুড়ি ওমলেট কপিভাজার মেজাজটা দেবে বিগড়ে। আমি ওতে নেই। তবে হ্যাঁ, ইলিশ মাছ ভাজা পেলে অবশ্যি কথা ছিলনা—'

ইলিশ মাছের নাম শুনে মনোজ প্রায় হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। কী ব্যাপার? মনোজ বলে, 'বাড়ির কথা মনে পড়ছে। গত বছর এমন সময় কী ইলিশ মাছই না খেয়েছি বাড়িতে। মা রান্নাও করেন তেমনি।'

বলা বাহুল্য, মনোজ 'বাঙাল',—পূর্ববঙ্গের লোক।

ইতিমধ্যে বনানীর ঘোষণা : সবাই হাতে হাতে প্লেট নাও, খিচুড়ি রেডি।

পলকের মধ্যে আমরাও রেডি। এবং বুফে-খানায় প্লেটের পর প্লেট সাবাড়। সবাই গোগ্রাসে গরম খিচুড়ি গিলছে। গোটা হপ্তা বিস্বাদ স্যুপ আর তদধিক বিস্বাদ কাঁচা, আধ পোড়া মাংস খেয়ে খেয়ে থেৎলানো মুখ বদলানোর পক্ষে এমন উপযুক্ত টনিক আর কোথায় মিলবে।

সেনগুপ্ত বললে—'আর না, এবার দেশে ফিরব।'

মিত্তির বলে—'আমিও। আচ্ছা, বলুন তো, দেশে ফিরলে চাকরি-বাকরি পাব তো?'

আমি বললুম, 'সাধুর দাড়ি দেখে যেমন গল্পের সেই লোকটির আদরের রামছাগলের কথা মনে পড়েছিল, আপনাদেরও তেমনি খিচুড়ির স্বাদে দেশের কথা মনে পড়েছে। হলফ করে বলতে পারি, কাল যখন আবার বান্ধবীদের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোবেন দেশের কথা বেমালুম ভুলে যাবেন। প্রবীরের কথা অবশ্যি আলাদা, বনানীর কড়া নজর রয়েছে।'

সেনগুপ্ত: না, না, বিশ্বাস করুন, এ জায়গা আর ভাল লাগছে না। আমাদের কারও না। এ সুইসগুলো কথায় বার্তায় চমৎকার, রোজগারও মন্দ করছিনে; কিন্তু কালা আদমি বলে সবাই আমাদের ঘেন্না করে। তার চেয়ে ঢের ভাল দেশে ফিরে ঘর সংসার পাতা।

রায়চৌধুরী: নেহরু গবর্নমেণ্ট আজকাল অনেক চালাক হয়ে গেছে, দেশে ফিরলেই হাজার টাকার মাইনের চাকরির ভেট আসবে না। আজকাল বিলেত ফেরতদের কানাকড়ি দাম নেই।

আমি তৎক্ষণাৎ বলি, 'দাম হবেই বা কী করে? এমন একদিন ছিল যখন, সারা তল্লাটে একটি কি দুটি বিলেত-ফেরৎ পাওয়া যেত, এখন বাংলাদেশের অবস্থা অন্য রকম। বিলেত ফেরতদের সংখ্যা এত বেশি, যে বিলেত যায় নি, তারই কদর বেশি। তারাই সংখ্যালঘু কিনা। সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ আগেও ছিল, এখনও আছে।'

মিত্তির: তাহলে বলছেন, দেশে ফিরলে চাকরি পাব না?

'পাবেন না কেন,' আমি জবাব দিই, 'স্পেশাল কোন কোয়ালি-

ফিকেশন না নিয়ে ফিরলে সাধারণ ইঞ্জিনিয়ার যা' পায় তাই পাবেন। দেশে ইঞ্জিনিয়ারের অভাব তো রয়েছেই।'

বনানী এঁটো প্লেটগুলো বেসিনে জড় করতে করতে বলে, 'সান্যালের কোনদিন যাওয়া হবে না, গেলেও ফিরে আসবে।'

'কেন কেন'—সান্যালের জিজ্ঞাসা।

'আপনার সঙ্গে যাবার জন্য যে অষ্টাদশী ফ্রলাইন তৈরী এবং ভারতকে শুধু 'তাজমহলের দেশ' বলে যিনি ভাবছেন, তিনি যখন কলকাতায় নেমে খোলা নর্দমা আর খাটা পায়খানা দেখবেন, 'বাপ বাপ' বলে নির্ঘাৎ ফের ইউরোপের উড়ো জাহাজ ধরবেন।'

'না, না, শী ইজ এ গুড গার্ল'—সান্যালের গলায় কৈফিয়তের সুর।

প্রবীর হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, বলে, 'মিত্তির', বাজেলের দাশগুপ্তের খবর শুনেছ?'

'তার আবার কী হয়েছে? সে তো গেল বছর দেশে ফিরেছে, মেম বিয়ে করে!'—মিত্তির জবাব দেয়।

'বাব বাগ, গিয়া'—প্রবীর রসিয়ে রসিয়ে শুরু করে—'দাশগুপ্ত তো কলকাতা চলে গেল। তার মেম বউ নাটালির দু মাস পর যাওয়ার কথা। দাশগুপ্ত কলকাতা থেকে ছুটে বোম্বে গেল বউকে জাহাজ থেকে তুলে আনতে। এদিকে সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট কলকাতায় রেডি।

'বোম্বেতে এক কেলেংকারি। বউ দাশগুপ্তকে দেখে বলে, 'নেহি যাউঙ্গি, দোসরা দোস্ত হো গ্যয়া।' জাহাজেই এক অস্ট্রেলিয়ান ছোকরার সঙ্গে ভাব জমেছে, তাকেই বিয়ে করবে।

'দাশগুপ্ত কী আর করে, ঘাড় চুলকে দাঁত কামড়ে কলকাতায় ফিরে এল। বেচারা!'

'বেচারা!'—আমাদের সকলেরও একই সঙ্গে খেদোক্তি।

'সুতরাং সান্যাল'—প্রবীরের উপসংহার—'যাবে তো বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে যেও। ফেলে গেলে পরে কিন্তু বুড়ো আঙুল দেখাতে পারে।'

মনোজ চৌধুরী এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি বাবা বান্ধবী টান্ধবীর মধ্যে নেই।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই বনানী হাসতে হাসতে বলে—'কী দরকার, তোমার তো বুড়ী ল্যাণ্ডলেডিই আছে!'

আড্ডা অনিবার্যরূপে বান্ধবী-কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি বলি, 'আর নয়, এবারে অন্য কথা হোক। কিংবা চল, সবাই বাইরে কোথাও বেরিয়ে পড়ি।'

'না না, টিপির টিপির বৃষ্টির মধ্যে কে বেরোয়'—রায়চৌধুরী বলে—'তার চেয়ে গান কিংবা খোসগল্প হোক।'

গানের কথা উঠতেই বনানীর আপত্তি 'ইম্‌পসিব্‌ল্‌, গলা ধরে আছে। তার চেয়ে অমিতদা, তুমি একটা কিছু গল্প বল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলুন'—সবাই ছেঁকে ধরল আমাকে।

পড়লুম বিপদে; কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা।

প্রবীর বললে, 'শিকারের গল্প জানেন? বাঘ কিংবা ভালুক শিকারের?'

'আমার চেহারা দেখে, কি শিকার। শিকারী মনে হয়?'—নিজের ক্ষীণ তনুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে শুধোলুম।

'যা হোক্, একটা কিছু বল—'—বনানীর ফের আবেদন।

'আচ্ছা, তাহলে প্রবীর যখন বলছে শিকারের এক ছোট্ট গল্পই বলি। তবে আমার নয়, প্রিন্স অব ওয়েলসের।'

সবাই ততক্ষণ আর এক দফা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ করে সেছে। আমিও শুরু করলুম:

ইংল্যাণ্ডের রাজকুমার এসেছেন ভারতবর্ষে। ভারত ভ্রমণের অন্য অঙ্গ—শিকার। মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে জানালেন, তেহরি গাড়োয়াল এলাকায় ভাল ভালুক পাওয়া যায় শুনেছি, সেখানে শিকারের ব্যবস্থা করুন।

'বন্দেগী জাহাপনা' বলেই বড়লাট হুকুম দিলেন তেহরী গাড়োয়ালের এক নেটিভ রাজাকে,—জলদি ভালুক শিকারের ব্যবস্থা করুন, প্রিন্স অব ওয়েলস্ অমুক তারিখে আসবেন।

রাজবাহাদুর পড়লেন অথৈ পাথারে। এই সীজনে ভালুক কাছে-

পিঠে কোথাও পাওয়া যায় না। এই এলাকায় ভালুক আসে অন্য সময়। কী করা, কী করা—রাজবাহাদুর ক্যাবিনেট মিটিং ডেকে বসলেন।

এদিকে দিনক্ষণ প্রস্তুত। বড়লাট আর প্রিন্স অব ওয়েলস কাড়া-নাকাড়া, ব্যাণ্ড পার্টি বাজিয়ে অকুস্থলে হাজির। রাজবাহাদুর বিগলিত বিনয়ে মান্য অতিথিদের খিদমৎগার করে চলেছেন।

রাত তখন একটা। গভীর জঙ্গল। হিস্ হিস্ শব্দ। মাচার উপর বসে আছেন প্রিন্স অব ওয়েলস, ভাইসরয় আর তেহরি গাড়োয়ালের রাজা। নীচে জ্বলছে মশালের আলো। ওদিকে পেছনে বিলিতি ব্যাণ্ড মহানন্দে নাচের বাজনা বাজিয়ে চলেছে তো চলেছেই।

হঠাৎ দূরে কিসের যেন ছায়া? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো বিরাট একটা ভালুক। এগিয়ে আসছে, আসছে, আসছে। প্রিন্স অব ওয়েলস তাক কষলেন।

ভালুক মাচার তলায় এসে পড়ছে। ট্রিগার টিপতে যাবেন, এমন সময় এ কী কাণ্ড, ভালুক হু'পা তুলে বাজনার তালে তালে ধেই ধেই নাচতে শুরু করে দিয়েছে। মুখে গদ গদ হাসি।

প্রিন্সের হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল। প্রিন্স তাকান বড়লাটের দিকে, বড়লাট তাকান রাজবাহাদুরের দিকে।

ভয়ে কাঁচুমাচু রাজবাহাদুর বলেন, 'আজ্ঞে হুজুর, এ সীজনে ভালুক জঙ্গলে থাকে না, অথচ আপনার হুকুম! শেষ-মেষ এক সার্কাস পার্টি থেকে অনেক টাকায় এই ভালুক ধরে এনে আজ বিকেলে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিলুম। ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা শুনে সার্কাসের এই ভালুকের সব তালগোল পাকিয়ে গেছে হুজুর।'

বড়লাট ঠোঁট দাঁত চাপলেন-'বেতমিজ'। ভালুকটা তখনও ফক্সট্রটের ভঙ্গী মেরে আপনমনে লাফিয়ে চলেছে।

আমি থামতেই এক চোট হাসি এবং প্রবীরের কণ্ঠে—'গুল!'

'তা 'গুল' বলতে পার,'—আমি জবাব দিই—'এই নাচিয়ে ভালুকটার সঙ্গে তোমাদের সুইস-বান্ধবীদের অনেকটা যেন মিল দেখতে পাচ্ছি।'

## প্রবঞ্চিতা মেয়ার

শান্তিনিকেতনে থাকতে আমাদের একটি জনপ্রিয় খেলা ছিল অ্যাকটিং। পিক্‌নিকে, এক্সকার্সনে অনিবার্য। প্রথম কে শিখিয়েছিল ঠিক মনে নেই ( সম্ভবতঃ সংগীত ভবনের শ্রীবীরেন পালিত ), তবে শুনেছিলুম জাপানীদের মধ্যে নাকি এ খেলার চল আছে।

খেলাটা মজার। মাঝখানে খালি জায়গা, দু'দিকে বসে থাকে দু'দল লোক। একদল থেকে একজনকে ডেকে আনা হল প্রতিপক্ষ দলের কাছে। কানে কানে বলা হলো একটি নাম—বার্ণাড বা রবীন্দ্রনাথ বা জো লুই। কিংবা অন্য যে-কোন একটি নাম। তাকে একটিও কথা না বলে আকারে ইঙ্গিতে অঙ্গভঙ্গি করে নিজের দলকে বোঝাতে হবে কী সেই নাম। মাঝের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে সে দেখাবে। বোঝাতে পারলে তাঁর দলের ভাগে পড়ল এক পয়েণ্ট। না পারলে গোল্লা।

ঠিক তেমনি এই দল থেকে আর একজনকে ডেকে নেওয়া হবে এবং একই কায়দায় অন্য কোন নাম বোঝাতে হবে। শেষে গুণে দেখা হবে, কার ভাগে কত পয়েণ্ট। বোঝানোর সুবিধের জন্যে সম্বল ছিল কয়েকটি সংকেত। যেমন দ্রষ্টব্য ব্যক্তি ছেলে হ'লে বুড়ো আঙুল। মেয়ে হলে ক'ড়ে আঙুল। আর তিনি যদি মৃত হন, তাহলে ঘাড়ের উপর দিয়ে কিংবা কোমরের পাশটায় একটু 'থাকগে' বলার ভঙ্গিতে দু'হাত দোলাতে হবে। ব্যস ঐ টুকুই, বাকি খেলোয়াড়ের কেরামতি। দ্রষ্টব্য ব্যক্তির চেহারা ছবি পেশা দেশ সব বোঝানোর দায়িত্ব ইঙ্গিতের। এই "মুদ্রাভিনয়ের" অভিজ্ঞতা কাজে লেগে গেল জার্মানি বেড়াতে এসে। সাধারণ লোক ইংরেজি জানে না, আমি জানি না জার্মান। তাদের সঙ্গে মিশতে গেলেই তাই শান্তিনিকেতন জীবনের সেই অ্যাকটিং খেলা বেমালুম চালিয়ে দি, দোস্তী তৎক্ষণাৎ জমে।

পূর্ব বার্লিনে এসে চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। সেই আটই মে, পঁচিশে বৈশাখ। আমাদের বাংলা দেশের উৎসব। কম্যুনিস্ট—শাসিত পূর্ব জার্মানির এই শহরে এসে দেখলুম, সেখানেও উৎসবের ছুটি। এই তারিখেই মিত্র শক্তির কাছে জার্মানির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আত্মসমর্পণের দিন। সবাই জড়ো হয়েছে শহরের লাগোয়া ওআর মেমোরিয়েলে।

গিয়ে দেখি আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। দুধারে ফার চেরী গাছের ভিড়, পপলারের সারি। কাতারে কাতারে লোক ফুলের মালা নিয়ে ঢুকছে, বেড়োচ্ছে।

অতিকায় এক মূর্তি সামনে এক উঁচু বেদিতে। সিঁড়ি বেয়ে নামছি, হঠাৎ একদল ছোকড়া ছেলেমেয়ে ছেঁকে ধরলো। চেঁচিয়ে উঠলো—'ইণ্ডার, ইণ্ডার, নেহরু"।

ব্যাপার কী? দলের একজন ভাঙা ইংরেজি জানে। বললে, "তোমার সঙ্গে ছবি তুলবো।"

কৃষ্ণবদন নিয়ে আমি শ্বেতাঙ্গিনীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অনেকগুলো ক্যামেরা একসঙ্গে বলল—ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক। আমি বললুম, "ডাংকেশ্যোন।" অর্থাৎ ধন্যবাদ।

এই খানেই আমার আলাপ এডমুর্টে মেয়ারের সঙ্গে। কিছুক্ষণের পরিচয়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না।

ছবি তোলার পালা শেষ করে বাঁ পাশের রাস্তায় স্তালিনের বাণী খোদাই করা ফলকগুলোর দিকে যখন এগোচ্ছি তখন পেছন থেকে হঠাৎ ডাক।—"হে ইণ্ডার!"

চেয়ে দেখি, লাল জ্যাকেট পরা কুড়ি বাইশ বছরের এক মেয়ে আমায় আঙুল নেড়ে ডাকছে। কৌতূহল অপরিসীম, তবু সাহস পেলুম না। একে বিদেশ-বিভূঁই, তদুপরি সুন্দরী তরুণী। না বাবা, দরকার নেই ঝামেলায়।

না দেখার ভাণ করে সামনে এগোলুম। কিন্তু আমি ছাড়লে কী হবে, 'কম্‌লি নেহি ছোড়তি।' মেয়েটি ছুটে পাশে এসে দাঁড়াল।

টানা চোখজোড়া আমার সারা গায়ে বুলিয়ে প্রশ্নের ভঙ্গিতে বলল—
—"কালকুট্টা ?"

আমার তখন উত্তর দেওয়ার ফুরসৎ নেই। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। মেয়েতো নয়, আগুন! পরনে লাল চামড়ার জার্কিন আর পুরু স্ল্যাক্স। যেমন ঠোঁট, তেমন নাক—একেবারে খোদাই করা। আর চোখ তো নয়, আগুনের হল্কা। এক একটা চাউনি, এক একটা অঙ্গ পুড়িয়ে মারছে। চুল ? তার তুলনা দেবার ভাষা আমার নেই। জীবনানন্দী ভাষায় একেবারে 'কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।' গোলাপী মুখের মায়া কাটিয়ে হাওয়ায় উড়ে যেতে চাইছে।

মেয়েটি তখনও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। আবার বললে—"কালকুট্টা ?"

এতক্ষণ সম্বিৎ ফিরে পেলুম। দু'বার ঢোক গিলে বললুম—ইয়া। অর্থাৎ 'ইয়েস।'

বললুম আর মরলুম। মেয়েটি আমায় বগলদাবা করে হিড় হিড় টেনে নিয়ে চলল। সদর ফটকের বাইরে ছোট মাঠটায় সার সার গাড়ি, সার সার মোটর সাইকেল, স্কুটার। একটি স্কুটারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এক গাট্টা গোট্টা মাঝবয়সী জার্মান। সুন্দরবনের বাঘিনী যেমন শিকার মুখে করে আনে জঙ্গলে, আমাকে তেমনি ওই মাঠটায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর ওই মাঝবয়সী জার্মানটার সঙ্গে 'হুম-হাম' করে কী যেন বলল, আর পলক ফেলতে না ফেলতে আমাকে ঠেলে বসিয়ে দিল ওই স্কুটারের পেছনের সীটে।

মুহূর্তে হুংকার। মেয়েটি সামনের সীটে বসে দিল স্টার্ট। একটিও কথা না বলে স্কুটার ছুটিয়ে দিল ঝড়ের বেগে। সামনে চওড়া অটোবান—ন্যাশনাল হাইওয়ে।

আমার তখন দেবীচৌধুরাণীর হরবল্লভের মত অবস্থা। 'ডুবিয়াই যখন গিয়াছি, তখন দুর্গানাম জপিয়া কী হইবে।' এদিকে গাড়ি, ওদিকে মোটর সাইকেল—আশি নব্বই কিলোমিটার বেগে আমাদের স্কুটার ছুটছে। বাড়িঘর, গাছপালা সিনেমার মস্তাজের মত দুদ্দাড়

পালিয়ে যাচ্ছে। আর আমি? সেই সুন্দরী খাণ্ডারণির কোমর জড়িয়ে রুদ্ধশ্বাস বসে আছি। তার ঘন কাল চুলের রাশ হাওয়ায় উড়ে আমার চোখে অনবরত ঝাপটা মারছে।

স্কুটার থামল এক গেঁয়ো গির্জার কিনারে। পাশেই আপেল গাছের বাগান। গাড়ি খাড়া করে রেখে মেয়েটি আমায় টেনে এনে বসাল ওই বাগানে। আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়ব ছাড়ব করছে। মেয়েটার নির্ঘাৎ কুমতলব আছে! গলা টিপে মেরে টেরে ফেলবে না তো?

এতক্ষণ পর সুন্দরী ঠোঁট খুলল। বিন্দুবিসর্গ বুঝলুম না। কট্টর জার্মান ভাষার কিড়িমিড়িতে আমি আবার তালগোল পাকিয়ে ফেললুম। যে দু'চারটি শব্দ সম্প্রতি আয়ত্তে এনেছি, তার জগাখিচুড়ি পাকিয়ে এবং শান্তিনিকেতনের সেই অ্যাক্টিং খেলার শরণ নিয়ে বলতে চাইলুম—"সুন্দরী, অনেক রহস্য করেছ, আর না। এবার আমাকে রেহাই দাও।"

পাত্রীটি সোজা নয়, আমার কথা আদপেই আমল দিল না। এবং টের পেলুম, শান্তিনিকেতনের ছাত্রী না-ই-বা হল, অ্যাকটিং খেলায় সে আমার চেয়ে সরস। একটা ডট পেন, একফালি কাগজ তার আকার ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়ে চমৎকার আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল! আমিও হুঁ-হাঁ করলুম, হাত নাড়লুম, ঠোঁট নাড়লুম।

বরাত ভাল সে জানে দু-চারটে ইংরেজি শব্দ। আর আমি জানি দু-চারটে জার্মান। ওই মুদ্রাভিনয়ের সঙ্গে জানা শব্দগুলো কাজে লাগাতে পেরে আমরা দুজনই মহাখুশী।

হঠাৎ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—"ভী শ্যোন ডু বিস্ট।" অর্থাৎ কিনা "তুমি বেশ সুন্দর দেখতে।"

মেয়েটি তো হেসে কুটোকুটি। চিৎকার করে উঠল—"আম্‌সো।" অর্থাৎ 'ঠিক বলেছ।' খানিক বাদেই সোহাগের সুরে বলল—"মাইন লীবলিং।" বলেই গলা জড়িয়ে ধরে আর কি।

খেয়েছে, আমি গলা বাঁচিয়ে পিছু হটে যাই।

মেয়েটির নাম, আগেই বলেছি, এডমুর্টে মেয়ার। বাড়ি বার্লিন থেকে একশ ষাট কিলোমিটার দূরে হাফেলবার্গে। ছুটির দিন, বেড়াতে এসেছে স্কুটারে চড়ে। কিন্তু আমার দিকে এই কৃপাদৃষ্টি কেন ?

দেখেই চিনেছি, তুমি ইণ্ডার, ভারতের লোক। আর চিনেছি তোমার বাড়ি কালকুট্টা—কলকাতায়। জান্তশ ব্যাগশি ?

আমি কিছুই ঠাওর করতে পারি না। জান্তশ ব্যাগশি ? এখানে পড়তে এসেছিল কালকুট্টা থেকে। চার বছর ছিল। এই দেখ না তার ফটো।

মেয়েটি খুশিতে ডগমগ এবং এবার ঠাহর হল, সন্তোষ বাগচি নামে কলকাতার কোন বাঙালী ছাত্রের কথাই বলছে ফ্রলাইন ! কিন্তু ক'লকাতা কি ছু'-তিনশ' লোকের পাড়াগাঁ, যে সবাইকে আমি চিনব ?

—"নিশ্চয়ই চেন"—মেয়েটির চোখ হঠাৎ ছলছল। যেন এক জোড়া চোখের ঝিনুকে স্বাতী নক্ষত্রের জল টলমল করে উঠল।

"তোমারই মত গায়ের রঙ। আমার মত ফ্যাক্‌ফ্যাকে ফর্সা নয়। ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যে লিপজিগে ! আলাপ থেকে ভালবাসা। জান্তশ আমায় কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে। দেশে পৌঁছেই আমাকে নিয়ে যাবে ? সে আশায় আমি এতদিন বসে-ছিলুম। আজ ছু'বছর হল, তার কোন চিঠি নেই।"

মেয়ার আর কথা বলতে পারল না, ফটোটা বুকে আঁকড়ে আমার দিকে অপলক চেয়ে রইল; চোখে মিনতি। যেন আমিই সেই সন্তোষ বাগচি—যে তাকে কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে। তাকে ভারত নিয়ে যাবে, এবং এখন যে কথার খেলাপ করছে। যেন আমার একটি কথার উপরেই এই মেয়েটির ভবিষ্যৎ, সব আশা-আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু কী উত্তর দেব এই বিদেশিনীকে ? হায় ভগবান, এমন বিপাকে কেন ফেললে আমাকে !

হাত তুললুম, ঠোঁট নাড়লুম। বোঝাতে চাইলুম। বিশ্বাস কর,

আমি ওকে চিনি না, অমন সুন্দর মুখের প্রতি অবিচার যে করে, সে নরাধম। কিন্তু তোমাকে কী বলে সান্ত্বনা দেব মেয়ার ?

মেয়ার রেগেমেগে উঠে দাঁড়াল। চোখের জল এক ঝটকায় মুছে ফেলে ফের স্কুটারে স্টার্ট দিল। আমি যেন অপরাধী, পিছু পিছু এগিয়ে পেছনের সীটে বসলুম। মেয়ার দাঁত কিড়মিড় করে কী যেন বলল। টের পেলুম ও বলতে চাইছে—সব ইণ্ডারই সমান।

আনন্দ, বিষাদ, ঘৃণা—একটার পর একটার সে প্রতিমূর্তি। মেয়ারের ঠোঁট কাঁপছে।

—গত আট মাস থেকে হেক্টার পেছনে ঘুরছে। ঠিক আছে, তাকেই বিয়ে করব। এতদিন তাকে পাত্তা দেই নি, আজ থেকে দেব। কালই বিয়ে করব হেক্টারকে।

মেয়ার কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললে সেই যত্নে রাখা ফটো।

স্কুটার আবার ফিরে চলল দ্বিগুণ বেগে। এবং দাঁড়াল ওআর মেমোরিয়ালের সেই ছোট মাঠটায়।

চোয়াড়ে চেহারার সেই মাঝবয়েসী জার্মানটি তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে। মেয়ারকে দেখেই দাঁত বের করে এগিয়ে এল।

আমার মুখে কোন কথা নেই। এক ঝলক আগুন আর এক ঝলক ঘৃণা আমার চোখে মুখে ছিটিয়ে মেয়ার হেক্টরের কোমর জড়িয়ে সেই স্কুটারে পেছনের সীটে বসল। এই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হেক্টরের সঙ্গেই মেয়ার এখানে এসেছিল।

পাশ দিয়ে স্কুটার বেরিয়ে যেতে মেয়ার আবার কটমট করে তাকাল আমার দিকে। আমি তখনও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি ঝড়ের বেগে উড়ে যাওয়া স্কুটারের দিকে।

## শেষ সাক্ষাৎকার

এ ধরনের আপ্যায়নের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

শিশিরকুমার তাঁর ঘরে ঢুকতেই বললেন—"এই পোশাক পরে আমার সামনে আর আসবে না।"

আমি নিজের দিকে আপাদমস্তক চোখ বুলাই। ভাবি, কী এমন অশালীন পোশাক পরে ফেলেছি, যা নিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়া যায় না!

অপ্রস্তুতির ধাক্কা সামলাবার আগেই সোফায় হেলান দেওয়া মাথাটা এদিক ওদিক নাড়াতে নাড়াতে শিশিরকুমার আবার বললেন, "বুঝতে পার নি তো? পারবেও না। ছাই রঙের ঐটে কী পরেছ ঊর্ধ্বাঙ্গে?"

আমি যেন কাঠগড়ার আসামী। আমতা আমতা করে বলি—"কেন, জহরকোট!"

"তাই জন্যেই তো বলছিলুম। ঐ পোশাক পরে আমার সামনে এসো না। জানো না বোধ হয়, তোমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালকে আমি পছন্দ করিনে। ওঁর নামে যে পোশাক, তাও আমার দু'চক্ষের বিষ।"

হকচকানো ভাবটা কাটিয়ে ইতিমধ্যে আমি কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করেছি। বললাম—"জওহরলালের প্রতি আপনি এত বীতরাগ কেন?"

"হবো না!"—প্রায় লাফিয়ে উঠে উত্তেজনার সুরে বললেন—"জওহরলালই তো দেশ বিভাগের জন্যে দায়ী। ইচ্ছে করলে তিনি দেশ বিভাগ রদ করতে পারতেন। কিন্তু করেন নি। দেশকে যাঁরা দু'ভাগ করেছে তাদের প্রতি বীতরাগ হবো না? বল কী হে ছোকরা? যাক, তোমাকে আর কী বলব, ছেলেমানুষ। তা' এখানে কী ব্যাপারে? কাকে চাই?"

"আজ্ঞে আপনার কাছেই এসেছি। আনন্দবাজার থেকে একটু আগেই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম।

"বুঝেছি, বুঝেছি বস।"

আমি এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি। ঘরের চারদিকে চোখ মেলবার ফুরসতও পেলাম।

সিঁথির মোড়ের কাছাকাছি বি টি রোডের গায়ে লাল রঙের ছোট বাড়ি! দোতলায় সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘর। তেল-চিটচিটে বিছানা। ওপাশে তক্তপোশের উপর ইতস্তত ছড়ানো একগাদা ইংরেজী-বাঙলা বই, পত্র-পত্রিকা। চারদিকে তাকের পর তাক। অজস্র বই তাক-গুলি থেকে উপচে পড়ছে। 'তাক লাগানো' ঘরের দেওয়ালে শিশির কুমারের কম বয়সের একটা ছবি, অন্য দেওয়ালের ছবি নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের।

স্তূপীকৃত বইয়ের মাঝখানে সেই ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে উদাস নয়নে তাকিয়ে আছেন গৌরবময় নাট্যসাম্রাজ্যের বাদশাহ আলমগীর। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাধর নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী। গায়ে ফুলহাতা গরম গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি, হাতে চুরুট। সত্তর বছর বয়সের ভারে দেহ অর্ধনমিত। চোখে চশমা। সন্ধ্যার অন্ধকারে ম্লান টেবিল ল্যাম্পের আলো ছাপিয়ে বহু ঘটনার সাক্ষী চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বল, জ্যোতিষ্মান।

তারিখটা মনে আছে! জানুয়ারির একত্রিশে। ছাব্বিশে জানু-য়ারির প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার শিশিরকুমারকে দিয়েছেন 'পদ্মভূষণ' উপাধি। খবর পেলাম, তিনি ঐ খেতাব ছেড়ে দিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার বাসনায় এক সাক্ষাৎকার নিতে তাঁর কাছে আমি এসেছি।

চেয়ে দেখি ভুঁরুটা কুঁচকে শিশিরকুমার একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন! সূচীপতন-নৈঃশব্দ্য ঘুচিয়ে হঠাৎ বললেন—"পড়াশোনা কিছু করেছ? বাঙলা নাটক, নাট্যশালা সম্বন্ধে কিছু জান? না জানা থাকলে কী আলাপ করবে আমার সঙ্গে?"

আমার সবিনয় নিবেদনে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—"পড়বে পড়বে, আরও ভাল করে বাঙলা নাটক পড়বে। অনেক কিছু জানার আছে। বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসও ভাল করে পড়বে। সকলের পড়া দরকার। স্বাধীনতাপূর্ব যুগে বাঙলা দেশকে প্রেরণা দিয়েছে কে? এই নাট্যশালা। উদ্বুদ্ধ করেছে কে? এই নাট্যশালা। নানা চরিত্রের ভেতর দিয়ে ইংরেজ তাড়ানোর স্বপ্নও দেখেছে বাঙলার নাট্যশালা। সেই নাট্যশালার আজ কোন কদর নেই। ভালো নাট্যশালাও নেই আজকাল।"

অনর্গল কথা বলতে বলতে শিশিরকুমার ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ফাঁক বুঝে আমি জানতে চাইলাম 'পদ্মভূষণ' উপাধির সম্মান তিনি কেন প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন।

সিগারেটের এক কৌটোয় চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি বললেন—"ঐসব জিনিস আমি কোনদিন পছন্দ করি নি। থিয়েটার ভালবাসি, নাট্যশালা ভালবাসি, বরাবর তাই নিয়ে আছি। আমাকে হঠাৎ সম্মান দেখানোর ঘটা কেন? কালই ভারত সরকারকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের এই সম্মান আমি চাইনে, সরকারী খেতাবে দরকার নেই আমার।"—শিশিরকুমারের কণ্ঠে কিছুটা অভিমান, কিছুটা উষ্মা।

আমি বললাম – "আপনার নটজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে—"

"থাক আর বলতে হবে না।"—আমার কথা শেষ হবার আগেই ডান ভুঁরুটা কপালের উপর ছড়িয়ে দিয়ে উত্তেজনার সঙ্গে বললেন—

"স্বীকৃতি? কিসের স্বীকৃতি? আজ তিন বছর নাট্যশালা ছেড়ে এমনি বসে আছি। কই, কেউ তো কোনদিন এসে বলছেন না, 'এসো তোমাকে একটা নাট্যশালা খুলে দিই, তোমার ইচ্ছেমত অভিনয় করে যাও।' আমার প্রতি দরদ থাকলে নাট্যশালার প্রতিও দরদ থাকত। ঐ পদবী দেবার বদলে খুশি হতাম, এই কলকাতার বুকে ভাল একটা নাট্যশালা খোলার কথা সরকার যদি ঘোষণা করতেন! তাছাড়া ঐসব খেতাব, পদবী জিনিসগুলোই ভুয়ো।

কোন দাম নেই। শুধু কতকগুলি খয়ের খাঁ সৃষ্টি করার মতলব। বৃটিশ আমলে যেমন ছিল রায়সাহেব, রায়বাহাদুর। আমি খয়ের খাঁর দলে নাম লেখাতে চাইনে।"

উত্তেজনায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন, গলা কাঁপতে থাকে। আমার মনে হয় এই ঘরটা যেন এক রঙ্গমঞ্চ, আর আমি যেন তাঁরই অভিনীত কোন এক নাটকে পাশে দাঁড়িয়ে মূকাভিনয় করে চলেছি। অভিনেতা শিশিরকুমার বাক্‌ভঙ্গীতে, হাতের মুদ্রায়, মুখের মাংস-পেশীর দ্রুত সঞ্চালনে, ভুরু ওঠানামায় কখনও যেন মাইকেল, কখনও আওরংজেব, কখনও জীবানন্দ, কখনও বা রামচন্দ্র। একটার পর একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে যায়। আমি নির্বাক, নিশ্চুপ।

হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে ফাঁকা দাঁতে ছোট ছেলের মত একগাল হেসে বললেন—"কথা কি জান, এই দেশ নাটকের কদরই বুঝল না। না সরকার, না জনসাধারণ, কেউ না। তোমরা ছেলেমানুষ। তোমরা জান না, স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে এই নাট্যশালার দান কত। গিরিশবাবু, অর্ধেন্দুবাবু ওঁরা সব নমস্য ব্যক্তি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—'এ নেশন ইজ নোন বাই ইট্‌স স্টেজ।' খাঁটি কথা। ডিউক অব ওয়েলিংটনকে কে মনে রাখবে? রাখে তো রাখবে শেক্সপীয়রকে, বার্নার্ড শকে।'

একটু থেমে নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করেন—"অনেক কথা বলার আছে। মুখ ফুটে বলা যায় না। লেখাও যায় না। এই ধর না, দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভাল কথা। কিন্তু তার দাম দিতে হল দেশ দুভাগ করে। দ্বিখণ্ডিত এই দেশে স্বাধীনতার মূল্য কী? সাধে কি রাগ করি জওহরলালের উপর। কত আশা করে দেশবাসী দেশের ভবিষ্যৎ তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সুভাষ বসু থাকলে এমন কাণ্ড ঘটত না। সুভাষ ছিল সত্যিকারের দেশ-প্রেমিক। চেয়ে দেখ আমার ঘরে আছে শুধু সুভাষচন্দ্রের ছবি। কী মনঃকষ্ট নিয়ে তাকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল। এসব কথা মনে

করলেই বহু অপ্রিয় কথা টেনে আনতে হয়। কাজ নেই অপ্রিয় কথায়, তার চেয়ে এসো অন্য কথা বলি। কবিতা পড়ো? ইংরেজি কবিতা? ব্রাউনিংয়ের 'লস্ট লীডার' পড়েছ? দাঁড়াও তোমাকে কবিতাটা পড়ে শোনাই।"

শিশিরকুমার এদিক-ওদিক বইটা খুঁজতে থাকেন। পান না। বাড়ির একজনকে ডাকেন বইটা খুঁজে দিতে।

"চা খাবে? খাও না? কী আশ্চর্য! লেখার কাজ কর কী করে? তাহলে আরও একটু বস। তোমাকে পুরোনো কথা কিছু বলি। আজকাল কেউ বিশেষ আসে না। অন্তরঙ্গ দুই একজন ছাড়া। জানো, আমি যখন প্রথম ম্যাডান থিয়েটারে অভিনয় শুরু করি, তখন পুরো দু'বছর আমার নাম কোন খবরের কাগজে বেরোয় নি। একমাত্র বিজ্ঞাপন ছাড়া। রঘুবীর, আলমগীর, অন্য একটি নাটক—কী যেন নাম ভুলে যাচ্ছি—করা সত্ত্বেও না। তারপর 'সীতা' নাটক করলুম। এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ। দুজনেই খুব প্রশংসা করলেন। 'সীতা' নাটক নিয়ে 'ফরওয়ার্ড' কাগজে লিখলেন বিপিন পাল মশাই। পর পর তিনটি প্রবন্ধ।

আমি আবার 'পদ্মভূষণ' খেতাব প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বলি—"আপনি পদ্মভূষণের খবর কখন পেলেন?"

"কাগজ পড়ে। ভোরবেলা খবরের কাগজ খুলে অবাক। দেখি আমি নাকি পদ্মভূষণ না কি হয়ে গেছি। সরকারী ভদ্রতার ডেফিনেশন আমার জানা নেই, তবে এই ব্যাপারে আগে আমার অনুমতিটা অন্তত নেওয়া উচিত ছিল। দিল্লি থেকে টেলিগ্রাম পেলাম দুদিন পর। টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল 'শ্রীরঙ্গমের' পুরনো ঠিকানায়। আমি যে তিন বছর আগে 'শ্রীরঙ্গম' ছেড়েছি, এ সংবাদ ভারত সরকারের জানা না থাকলেও বাঙলা সরকারের নিশ্চয়ই জানা ছিল।"

রাত বেড়ে যাওয়ায় বিদায় চাইলাম। বললেন, 'এসো।' নমস্কার জানিয়ে চলে আসছিলাম। হঠাৎ ডেকে বললেন—

"দাঁড়াও। একটা কাহিনী তোমাকে শোনাই। তিন বছর আগের কথা। বাড়িভাড়ার দায়ে 'শ্রীরঙ্গম' ছাড়তে চলেছি। তখন একজনকে ডেকে বলেছিলাম—ঠিক আছে, টাকার অভাবে 'শ্রীরঙ্গম' না হয় ছেড়ে দিলাম, তাতে দুঃখের কী আছে। বাঙলা দেশ নাট্যশালার কদর বোঝে। দেখো, এক বছর দেড় বছরের মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আজ তিন বছর পর তোমাকে বলছি—আমি সেদিন ভুল ভেবেছিলাম, আমি সেদিন ভুল বলেছিলাম।"

দরজার গোড়ায় আমি স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনি। ক্ষণ-নীরবতা ভেঙে শিশিরকুমার বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন—"আচ্ছা এসো।"

তারপর আরও দুদিন শিশিরকুমারের বাড়ি গিয়েছিলাম। আনন্দবাজারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে তিনি খুশীই হয়েছিলেন। টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এসো আর একদিন।'

পরের হপ্তায় আবার যেদিন তাঁর বাড়ি যাই আমার সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত (মৌলানা কাফী খান)।

সেদিনেরও একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল 'জাতীয় নাট্যশালা।' নাট্যশালাটি কোথায় হবে, কী রকম হবে তার একটা খসড়াও তৈরি হয়ে গেছে। নির্মলবাবু এই ব্যাপারে দারুন উৎসাহী। শিশির কুমার জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠিয়ে দিলেন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের জন্যে নির্মলবাবুর মারফৎ।

'আনন্দবাজারের' জন্যে ঐ ধরনের একটা প্রবন্ধ আমি চাইলাম। বললেন—"বাঙলা লেখার সময় নেই চোখটা বড় 'ট্রাবল' দিচ্ছে। অপারেশন করাব শীগগির। বরং তুমি ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে বাঙালায় একটা খাড়া কর। আমি ছাপার আগে সংশোধন করে দেব।"

তারপর চলল পুরোনো দিনের থিয়েটার নিয়ে নানা ধরনের আলাপ। অধিকাংশ ঘটনাই শিশিরকুমারের অভিনয় জীবন নিয়ে। ঘরে আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন, শিশিরকুমারের প্রত্যেকটি অভিনয়ের কথা যাঁর নখদর্পণে। কোন একটা ব্যক্তিগত কাহিনী

বলতে বলতে শিশিরকুমারের যখন পুরো ঘটনা মনে পড়ছিল না, তখন ঐ ভদ্রলোকই বিস্মৃত অংশ মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।

শিশিরকুমার হঠাৎ আমাকে বলেন, "তোমাকে বলে রাখছি অমিতাভ, জাতীয় নাট্যশালা আমি দেখে যাবই।"

"হঠাৎ এত আশাবাদী হয়ে উঠলেন কী দেখে?" আমি প্রশ্ন করি।

"কোষ্ঠী দেখে। এক জ্যোতিষী সেদিন এসেছিল আমার কাছে। বলে গেছে, দুবছরের মধ্যে আমার আশা পূর্ণ হবে। জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমার অন্য কোন আশা, অন্য কোন সাধ তো নেই।"

আমি জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী মুলতুবি রেখে বলি, 'আপনি ডাঃ রায়কে এই ব্যাপারে বললেই তো পারেন।'

"বিধানবাবুর কথা বলছ? উনি আমার থিয়েটারের একজন বড় সমঝদার ছিলেন। প্রায় সব নাটকেই তাঁকে টিকিট কাটতে দেখেছি। কিন্তু তাঁকে বলে কোন লাভ হবে না। কয়েক বছর আগে আমাকে একটা সরকারী পদ দিতেও চেয়েছিলেন। বিধান-বাবুর বাড়িতে কয়েকদিন যাওয়া আসাও করি। কিন্তু মতে মিলল না। সরকারী পদ নিয়ে বিপদে পড়ি আর কি! ঐসব কাজের অনেক ফ্যাসাদ—সরকারের উদ্যোগে কোন নাটক নামালেই থাকবে ওদের হস্তক্ষেপ। আমার কোন হাত থাকবে না, ওদের ফরমাস মত কাজ করতে হবে, নাটক প্রযোজনা করতে হবে। ওসব আমার পোষায় না। সরকার এমন একটি নাট্যশালা করুন, যেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রযোজকের; কিন্তু বিধানবাবুর কথায় ভরসা পেলুম না। 'না' বলে সোজা চলে এলুম। আর ওদিকে পা বাড়াইনি।"

"তারপর ভেবেছিলাম,"—শিশিরকুমার বলেন, - "জনসাধারণের সহযোগিতায় অভিনয়ের পালা চালাব। তাও হল না। অনেকেই অভিনয়ের দাবি নিয়ে আসেন। কিন্তু কারও কাছে টাকা নেই।

ভাল নাটক নামাতে হলে টাকার দরকার। নতুন নাটক করার বড় ইচ্ছে। কদিন রবীন্দ্রনাথের 'মালিনীর' রিহার্সেলও দিয়েছিলাম। কিন্তু টাকার অভাবে স্টেজে নামান গেল না। এখন দিব্যি বেকার বসে আছি। ঘরে বসে চুরুট টানি, আর জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন দেখি।"

আমি ও নির্মলবাবু যখন বিদায় নিলাম, তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। যাবার আগে বললেন, "মাঝে মাঝে এসো, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগে।"

শিশিরকুমারের টেলিফোন পেয়ে আর একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম দুপুরবেলা। সেদিনেই শেষ দেখা।

আমি দোতলায় উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি তিনি ফিটফাট সেজে নিচে নেমে এলেন। বললেন, "তোমাকে এ সময় ডেকে বড় অন্যায় করে ফেলেছি। এখন তো বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না। আমাকে এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে চোখ পরীক্ষায় যেতে হবে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলা বরং এসো। তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

রাস্তায় নেমে আবার বললেন, "এখন কোথায় যাবে?"

"অফিসে।"

"তাহলে এসো, তোমাকে পৌঁছে দিই, ট্যাক্সিতে। আমি তো ঐদিকেই যাব।"

আমি বললাম—"আপনি যান, আমি অফিসের গাড়ি নিয়ে এসেছি।"

কী জানি কী ভেবে হঠাৎ তিনি বললেন—"তাহলে তো মিছিমিছি ট্যাক্সি ডাকলুম। আগে জানলে তোমার গাড়িতেই তো বেশ যাওয়া যেত। কয়েকটা টাকা বাঁচত।"

বললাম—"ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে চলে আসুন না এই গাড়িতে।"

"না থাক, আমি চলি। সন্ধেবেলা এসো।"—শিশিরকুমারের ট্যাক্সি সামনে এগিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যেয় তাঁর বাড়ি আমার যাওয়া হয়নি। আর কোনদিনই যাওয়া হল না। উনত্রিশে জুন রাত দেড়টায় হৃদরোগে তিনি মারা গেলেন। একেবারে হঠাৎ। তাঁর বহু ঈপ্সিত জাতীয় নাট্যশালা দেখে যাবার সাধ অপূর্ণই রইলো।

## পরশুরাম

রাজশেখরবাবুর সঙ্গে আমার একবার মনোমালিন্য হয়েছিল। বছর চৌদ্দ আগে একটি ঘটনায় তিনি ভীষণ চটেছিলেন। তারপর অবশ্য অনুতপ্ত হয়ে লিখেছিলেন, আমি যেন আর ক্ষোভ পুষে না রাখি। সেই কাহিনীটাই আজ বলি।

১৯৪৭ সালে আমরা কয়েকজন শান্তিনিকেতনে 'ভুশণ্ডির মাঠে' অভিনয় করি। অভিনয়টা ছিল অভিনব। বন্ধুদের ফরমাশ। এক রাত্তিরে বসেই পরশুরামের লেখা গল্পটির গীতিনাট্য রূপ দিই!

আমি শিক্ষাভবনে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। শুভময় ঘোষ আর বিশ্বজিৎ রায় একদিন এসে বললে, "আনন্দমেলার জন্য তোকে একটা নাটক লিখতে হবে কালকের মধ্যে। 'আনন্দমেলার' আর তিনদিন বাকি, ওই দিন আমরা নাটক মঞ্চস্থ করব।"

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি এবং রাত জেগে জেগে একটা মজার নাটক তৈরি করলুম। কারিয়া পিরেত, যক্ষ, ব্রহ্মদৈত্য, শাকচুন্নি, পেত্নির মুখে জুড়ে দিলাম অজস্র হাসির গান, এবং দেড় ঘণ্টার উপযোগী একটা চেহারা দিলুম ওই গল্পের।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল রিহার্সেল। অধিকাংশ গানের চমৎকার সুর দিলেন কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য এবং অরবিন্দ বিশ্বাস। একটা গানের সুর লাগালেন শান্তিদেব ঘোষ স্বয়ং। আর অভিনয় যেদিন হবে মঞ্চ সাজানোর ভার নিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এলেন রামকিঙ্কর এবং বিনায়ক মসোজি। শৈলজারঞ্জন মজুমদারও কোরাস গান ঠিক করে দিতে নিজেই এলেন। বনবাদাড় উজাড় করে আর আলোর কেরদানি দেখিয়ে সিংহসদনের মঞ্চ হল তদধিক চমৎকার।

অভিনয় দেখে শান্তিনিকেতনের সবাই থ'। কালিঝুলি মাখা

ভূতপ্রেতের দল আমাদের নিয়ে দারুন হৈ চৈ। কর্তা-ব্যক্তিরা অনুরোধ করলেন, পরদিন আবার অভিনয় করতে। বললেন—এমন গান, এমন অভিনয় শান্তিনিকেতনে ইদানীং হয় নি।

পরদিনের অভিনয় হল আরও চমকদার এবং রাতারাতি সকলের কাছে আমাদের খাতির বেড়ে গেল। আশ্রমের পথেঘাটে শুধু 'ভুশণ্ডির মাঠে'র গান। সকাল বেলা ক্লাস চলেছে, হঠাৎ শাল-বীথির ওই পারে শোনা যায় পেত্নির গান—'আয়রে চিংড়ি মাছ আয়রে', কিংবা আম্রকুঞ্জের তলায় ব্রহ্মদৈত্যরূপী শিবু ভটচাজের গান—'চমকি চলিতে থমকি দাঁড়ালে, কে তুমি ডাকিনী চলেছ আড়ালে।'

বিকেলে খেলার মাঠে, এক্সকার্সনে, পিকনিকে হরদম ফরমাস চলে 'ভুশণ্ডির মাঠে'র গানের। তাছাড়া আমরা অভিনেতার দল একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম বলে শ্রীঅনিলকুমার চন্দ তো আমাদের দিয়ে যেখানে সেখানে যখন তখন নাটকটাই পুরো অভিনয় করিয়ে নিতেন।

নাটকটির শুরু ছিল প্রাচীন যাত্রা গানের কায়দায়। প্রস্তাবনায় ছিল তুড়ি এবং জুড়ির ভূমিকা। তুড়ি সেজেছিল কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য এবং জুড়ি বিশ্বজিৎ রায়। ব্রহ্মদৈত্যরূপী শুভময় ঘোষ এখন পরলোকগত। সে মস্কোতে অনেকদিন কাজ করেছে। সড়াক করে তাল গাছ থেকে নেমে পড়া কারিয়া পিরেত সেজেছিলুম আমি নিজে এবং যক্ষবেশী নাদু মল্লিক সেজেছিল অরুণ বাগচি।

পেত্নির ভূমিকা নেয় প্রবীর গুহঠাকুরতা, ডাইনি শ্যামল মুখো-পাধ্যায় (একবার সুদেব গুহ) এবং শাঁকচুন্নি হীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী (একবার প্রণব গুহঠাকুরতা)। তাছাড়া বিভাস সেন ছিলেন অন্তরালের সকল ভার একসঙ্গে নিয়ে। পাত্রপাত্রী সকলেই শান্তি-নিকেতনের ছাত্র।

'ভুশঙ্গীর মাঠে'র নামডাক পৌঁছল কলকাতার চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মারফত। রাজশেখর বসুও শুনলেন অভিনয়ের কথাটা। তিনি দেখার বাসনা প্রকাশ করলেন।

শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ রাজশেখর বসুর ইচ্ছে শুনেই রাজী। ১৯৪৮ সালের বাংলা নববর্ষ উৎসবে রাজশেখর বাবুকে নিমন্ত্রণ জানানো হল এবং সেদিন রাতেই ব্যবস্থা হল 'ভুশণ্ডির মাঠে' অভিনয়ের লাইব্রেরির বারান্দায়।

অভিনয়ের পর রাজশেখর বাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "আমার মেয়ে এবং জামাইয়ের মৃত্যুর পর, অর্থাৎ প্রায় বিশ বছর পরে এই প্রথম একটি আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিলাম এবং আপনাদের অভিনয় দেখে বড় আনন্দ পেলাম। আমি ভাবতেই পারিনি আমার গল্পের ভূত প্রেত এমন মজাদার মজাদার গান গেয়ে আসর মাৎ করবে। কাল সকালে একবার আসবেন 'উত্তরায়ণে।"

রাজশেখর বাবু উত্তরায়ণের 'উদয়ন' বাড়িতে সেবার উঠেছিলেন। আমরা দল বেঁধে দেখা করতে গেলুম। যেতেই বললেন, "আপনাদের সকলের অটোগ্রাফ চাই।"

বলেন কী! আমরা তো ভেবেছিলাম তাঁর সঙ্গে ছবি তুলে আমরাই অটোগ্রাফ নেব। তিনি বললেন—"আমার চেয়ে আপনাদেরই জিত বেশি। তাই অটোগ্রাফ আমারই দরকার।"

আমি নাট্যরূপের একটা পাণ্ডুলিপি তাঁকে উপহার দিই তখন। তিনি সেটাতেই আমাদের সকলের অটোগ্রাফ নিলেন এবং উত্তরা-য়নের বারান্দায় একটা গ্রুপ ফটোর মাঝখানে মধ্যমনি হয়ে ক্যামেরায় ধরা দিলেন।

রাজশেখরবাবু কলকাতায় ফিরে আরও দশজনকে জানালেন এই অভিনয়ের কথা। কয়েকজন শান্তিনিকেতনে ছুটে এসে কলকাতায় অভিনয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। আমরা সবাই তখন ছাত্র। এই অনুরোধে আমরা তো লাফিয়ে উঠলুম।

১৯৪৮ সালের পঁচিশে জুলাই মনোজ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে শ্রীরঙ্গমে আবার অভিনীত হল 'ভুশণ্ডির মাঠে'।

রাজশেখর বাবু অসুস্থ থাকায় ইচ্ছা সত্ত্বেও সেদিনকার অভিনয়ে আসতে পারলেন না।

কলকাতার লোকেরা একদিনের অভিনয়ে তৃপ্ত হলেন না। তাঁদের দাবি, আবার করতে হবে। আমাদের ততক্ষণে উৎসাহ ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে-ই করতে হল। তারিখ ধার্য হল ১৯৪৯ সালের ১১ জুলাই, স্থান 'নিউ এম্পায়ার', উদ্যোক্তা বিশ্বজিতের ছোট মামা সমীর দত্ত।

এতকাল অভিনয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হয়নি। এই প্রথম সেই ভাবেই প্রযোজক এগোলেন। কে একজন তখন বললেন, তাহলে কিন্তু মূল লেখক রাজশেখরবাবুর অনুমতি নেওয়া দরকার। এদিকে অবশ্য পোস্টার পড়ে গেছে। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপনও চলছে।

আমি আর বিশ্বজিৎ ৭২, বকুলবাগান রোডে রাজশেখর বাবুর বাড়িতে অনুমতি নিতে গেলাম। ফরাসপাতা নির্জন বৈঠকখানা ঘরে আমরা দুজনে বসে আছি, তিনি চটি পায়ে দোতলা থেকে নামলেন, আমরা প্রণাম করতে এগোলুম। রাজশেখরবাবু ঠাণ্ডা গলায় বলেন "না, দরকার নেই, আমি কারও প্রণাম নিই না।"

বিশ্বজিৎ আমতা আমতা করে নিবেদন করলেন "কাল অভিনয় নিউ এম্পায়ারে, আপনার অনুমতিটা—"

রাজশেখর বাবু উষ্মার সঙ্গে জবাব দিলেন—"বিজ্ঞাপন তো দিয়েই দিয়েছেন, আমার অনুমতির আর কী দরকার। আচ্ছা, নমস্কার।" বলেই তিনি দোতলায় উঠে গেলেন, আমরাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সদর রাস্তা ধরলাম।

কিন্তু এখন উপায়? অভিনয় তো বন্ধ রাখা যায় না, অথচ রাজশেখরবাবু যদি ফের আপত্তি তোলেন? শুনতে পেলুম তিনি আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে আছেন।

বিশ্বজিৎ আর আমি দুজনেই মুসাবিদা করে তখনই বাড়ি ফিরে এক চিঠি পাঠালাম, আগে না জানানোর জন্য ক্ষমা চেয়ে এবং ঠিক করে ফেললুম অভিনয় করবই, যা থাকে বরাতে।

পরদিন রাজশেখরবাবুর জবাব পেলাম। চিঠিটা হুবাহু এইরূপঃ—

৭২, বকুল বাগান রোড
কলিকাতা
১৯/১০/৪৯

সবিনয় নিবেদন -

আপনার পত্র কাল সন্ধ্যায় পেয়েছি। আপনারা আমার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং অভিনয় করেছেন। অতএব এখন অনুমতি নিরর্থক।

বিনীত—
রাজশেখর বসু।

তুলোট কাগজে হরিতকির কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। এক একটি অক্ষর আমার কাছে যেন বজ্রশেল।

ক্ষমা চাইবার জন্যে আবার তাঁর বাড়িতে গেলাম। তিনি দেখাই করলেন না। আমি তখন অনুশোচনায় মরছি। এতবড় একজন মনীষীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে শেষে কিনা ভরাডুবি হল! এদিকে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মারফৎ শুনতে পেলুম, রাজশেখর বাবুর রাগ পড়েনি।

একদিন বেড়াতে গিয়েছি আর্ট প্রেসের একদা-মালিক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি রাজশেখর বাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং এই মুখোপাধ্যায় পরিবারে গিয়ে রাজশেখরবাবুর নিজের হাতে তৈরি করা নেবু ইত্যাদির আচার প্রায় খেতাম। রাজশেখরবাবুর শখ ছিল আচার তৈরিতে এবং নরেনবাবুকে প্রতি হপ্তায় এক এক শিশি উপহার দিতেন।

নরেন বাবুর ছেলে অরুণদা বললেন—"রাজশেখর বাবু তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় এখন বড় অনুতপ্ত। তুমি তাঁকে একটা চিঠি দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও এবং দেখা কর একদিন।"

আমি একশ'বার ক্ষমা চাইতে রাজী। বাড়ি ফিরেই আর একখানা চিঠি ছাড়লুম। এবং পরদিনই জবাব হাজির।

৭২, বকুলবাগান রোড,
কলিকাতা
১৫/১১/৪৯

সুহৃদবরেষু,

আপনার পোস্টকার্ড যথাকালে পেয়েছি। আমার বিজয়ার নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানবেন। অভিনয় সম্বন্ধে আপনি আর কোনও ক্ষোভ মনে রাখিবেন না, আমারও মনে ক্ষোভ নেই।

রাজশেখর বসু

আমি চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। আগের চিঠির সঙ্গে এ চিঠির ভাষায় ও বক্তব্য কত তফাৎ। দু'একদিনের মধ্যে তাঁর বাড়িতে আমরা গেলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বললেন, জানালেন ভুল বোঝাবুঝি যেন কেউ আর মনে না রাখি।

রাজশেখরবাবু আমায় বলেছিলেন মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যেতে। আমি যেতাম এবং একদিন তিনি অনুরোধ করেন, তার লেখা আরও কয়েকটি গল্পের গীতিনাট্যরূপ দিতে!

সে অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের স্মৃতি চিরকাল আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

## অভিভাবক ডাঃ রায়

ডাঃ রায়ের কথা উঠলেই দণ্ডকারণ্যের একটা ছবি আমার সামনে ভেসে ওঠে। অমরকোট দণ্ডকারণ্যের একেবারে ভিতরে। চারদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। তারই মাঝখানে ছোট্ট একটি ডাকবাংলোর লাগোয়া তেঁতুলগাছের তলায় সন্ধেবেলা বসে আছেন ডাঃ রায়। পায়ে চটি, গায়ে ফতুয়া। হ্যাজাক বাতির আলোয় তাঁর তিন দিক ঘিরে বসে আছেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী আর অফিসাররা। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, মায়া ব্যানার্জি, ডি. এম. সেন—আরও অনেক। আমিও আছি সঙ্গী সাংবাদিক হিসাবে। ১৯৬০ সাল। দণ্ডকারণ্যের বাঙালী উদ্বাস্তুদের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে এসেছেন ডাঃ রায়!

একটা ইজিচেয়ারে পা তুলে বসে আছেন। কথা একাই বলছিলেন তিনি, আমরা সবাই শ্রোতা। তাঁর জীবনের নানা ঘটনা নানা অভিজ্ঞতা—যা তাঁর নিজের মুখে শোনাও এক অভিজ্ঞতা। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, পাতার শব্দ, হাওয়ার সামান্য দুলুনি আর একপাল লোকে ঘেরা ডাঃ রায়ের চোখদুটো হ্যাজাকের আলোয় জ্বলজ্বল। একটা তৃপ্তির ভাব সারা মুখে। সেই মুহূর্তে তাঁকে শুধু একজন মুখ্যমন্ত্রী বলে মনে হচ্ছিল না। যেন বিরাট এক পরিবারের বর্ষীয়ান অভিভাবক। আমরা তাঁর পুত্রকন্যা নাতিনাতনীর দল। স্নেহে-মমতায় আমাদের সকল সুখদুঃখকে আবৃত করে রেখেছেন।

দীর্ঘদিন আগে দেখা পরিবার-প্রতিপালক ডাঃ রায়ের ছবি আগে পরে অন্যভাবে আরও অনেক দেখেছি। রাইটার্স বিল্ডিংসের করিডরে, তাঁর আপিসঘরে, বাড়িতে কিন্তু দণ্ডকারণ্যযাত্রার পর থেকে তাঁকে অভিভাবকের রূপে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গ নামক এক বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের একজন কর্তব্যনিষ্ঠ ওহৃদয়বান অভিভাবক।

আমি তখন রিপোর্টার। রাইটার্স বিল্ডিংসে গেলেই দেখা হয় না।' এখনকার মতো ছুট করে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে তখন ঢোকা যেত না। তিনি ডাকলে বা কোন জরুরী প্রশ্ন থাকলেই আমরা যেতাম। তবে দেখা হত রোজই। দুপুরে খাবার সময় করিডর দিয়ে নিজস্ব লিফটের দিকে মেঝেতে কোঁচা লুটিয়ে সচিবদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোতেন, প্রেস করনার থেকে আমরা কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করতাম। উনি তাকানো মাত্র দু'চারটি প্রশ্ন করা হত, তিনি জবাব দিতেন। ওতেই খবর হয়ে যেত।

তাকে ভয়ও পেতাম মাঝে মাঝে। না জানি সকালে ছাপা কোন খবরের ভুলভ্রান্তি ধরে বকাবকি করেন। লিফটে উঠে গেলেই নিশ্চিন্দি। একদিন মনে আছে, কী একটা খবর যেন ওঁর পছন্দ হয়নি। লিফটে যাবার পথে সেই বিখ্যাত বাঁজখাই গলায় হাঁক দিলেন, "অমুক কাগজের কে আছে?" বলির পাঁঠার মতো রিপোর্টারটি এগোতেই বললেন, "ব্যাপারটা কী, তোমরা গাঁজা খাও নাকি?"—বলেই মুখ নামিয়ে হাত জোড়া করে গাঁজা খাওয়ার ভঙ্গী করলেন।" কোন্ খবর, কী বৃত্তান্ত জানার আগেই লিফট অধঃপতিত।

রোজ সকাল আটটায় রাইটার্সে আসতেন, রাত আটটায় বাড়ি ফিরতেন। মাঝখানে শুধু কাজ আর কাজ, সই আর সই, ফোন আর ফোন। আর ওই দুপুরের একটু ফাঁকে বাড়িতে খেতে যাওয়া। গেনজি ছাড়াই যে জামা তিনি গায়ে সব সময় পরতেন তার নাম আমরা দিয়েছিলাম 'শানজাবি'। নীচে পানজাবির মতন ঝোলানো, আর উপরে শার্টের কলার। ওই মার্কামারা পোশাক পরেই তিনি বিধান সভায় তর্কযুদ্ধে কাবু করতেন প্রতিপক্ষকে, জনসভায় বক্তৃতা দিতেন প্রবল দাপটে এবং ডাক্তারিও চালাতেন অখণ্ড প্রতাপে। নানা সময়ে ডাঃ রায়কে দেখা আরও কয়েকটি ছবিও মনে পড়ছে। ১৯৫৬ সালে সরকারী টাকায় যখন নন্দলাল বসুর ছবির এলবাম বেরোল, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম তাঁকে বইটি উপহার দিতে। পাতা ওলটাতেই তাকদা-র

একটা ছবি বেরোল। তিনি বললেন, 'শান্তিনিকেতনে পাইন গাছ আছে বুঝি?' আমরা চুপ। আবার আর একটি পাতা উলটে দাণ্ডি মার্চের সেই বিখ্যাত ছবিটি বেরোতেই মনোযোগ সহকারে দেখে বললেন, "না ঠিকই আছে। পায়ের ও হাতের পেশী—'ফিবুলা টিবিয়া' ইত্যাদি ফিজিওলজিতে যেমন, তেমনআছে।"—আমরা আবার চুপ। একটা ফোন আসামাত্র নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম।

শান্তিনিকেতনে ১৯৫৭ সালের সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে একটু অন্যরকম লেগেছিল। সেখানে পরিবেশ, আম্রকুঞ্জ, সপ্তপর্ণী, হলুদ চাদর—সব কিছুই তাঁর কাছে কৌতুহলের বিষয়, পাশে বসা নেহরুর মতো আত্মীয় সম্বন্ধে বাঁধা নয়। ডাঃ রায় সব কিছুই দেখছেন, অথচ যেন কিছুই দেখছেন না। এমন সময় ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে দেখে মুখে হাসি ফুটল। দুজনে ব্রাহ্মসমাজের পুরানো পরিচয়। "এই যে, কেমন আছেন," বলে তাই ইন্দিরা দেবীর কাছে গিয়ে যেন হাঁফ ছাড়লেন।

ডাঃ রায়কে একবার মাত্র খুব খুশী দেখেছিলাম। যে বছর 'ভারতরত্ন' হলেন সেবার। বিকেলবেলা রাইটার্সে অভিনন্দন জানাতে যখন আমরা রিপোর্টাররা তাঁর ঘরে ঢুকলাম, দেখি সারা মুখে আনন্দের ছাপ। আমাদেরও খাতির করে বসিয়ে চা খাওয়ালেন।

আর একটি কাহিনী বলে নিই এক ফাঁকে। আমি সাংবাদিক হিসাবে ডাঃ রায়ের অনেক বক্তৃতা, অনেক সাংবাদিক সম্মেলন, অনেক কথাবার্তা খাতায় টুকে রেখেছি। একবার কিন্তু তার একেবারে বিপরীত ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান রিপোর্টার যার মুখের কথা ডাঃ রায় খাতাকলম নিয়ে টুকে নিয়েছেন পুরো আধঘণ্টা। বিহারের বেতিয়া শিবিরে বাঙালী উদ্বাস্তুদের দুঃখকষ্ট দেখে এসে আনন্দবাজারে কয়েকটি রিপোর্ট দিয়েছিলাম। সেগুলি পড়ে ডাঃ রায় বিচলিত হন। রিপোর্ট ছাপার পরদিন আমাদের সম্পাদক আমাকে বলেন; "ডাঃ রায় আপনাকে রাত্রে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন।" শুনেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে

যায়। জানি না, কী ভুল করেছি। ডাঃ রায় নিশ্চয়ই বকাবকি করতে তলব করেছেন।

যথাসময়ে বাড়িতে গিয়ে পরিচয় দিতেই তিনি বললেন, 'বসো।' আমি বসলাম। তারপর? ডাঃ রায় বললেন, "বেতিয়ায় যা দেখেছ আরও বিস্তারিত করে আমাকে বলো।"

আমার ধড়ে প্রাণ এলো। গুছিয়ে সব বললাম এবং রায় আমার কথা সঙ্গে-সঙ্গে টুকে নিতে লাগলেন। লেখার মাঝে মাঝে দু'একবার বললেন, "আঃ একটু আস্তে। এত তাড়াতাড়ি করলে লিখব কী করে?"

পরে শুনেছিলাম, আমি চলে যেতেই দিল্লীতে তৎক্ষণাৎ ট্রাংক কল করে তখনকার কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নাকে একহাত নিয়েছিলেন ডাঃ রায়—পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণীর মানুষের মহাপ্রাণ অভিভাবক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

## লুইভিলের লুই বাবা

নাম টমাস নারটন, লোকে বলে লুই বাবা—ফাদার লুই। লুই বাবা থাকেন লুইভিলের কাছে। লুইভিল মধ্য আমেরিকার কেনটাকি রাজ্যের সদর দপ্তর। সেখান থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে গেটসেমানি —লুই বাবার আশ্রম।

শ আড়াই মৌনী সাধু, গরু বাছুর, খেতখামার আর পাখিডাকা ছায়াঢাকা পবিত্র পরিবেশ নিয়ে আশ্চর্য এক শান্তিনিকেতন। যেন বৈদিকযুগের ঋষিকানন। মনেই হয় না এই জায়গাটা ট্যুইস্ট, হিপি আর বুরবন অন দি রক-এ মশগুল বিংশ শতাব্দীর আমেরিকারই অংশ। ভাবতে পারা যায় না নিউইয়র্ক, শিকাগো এই আশ্রমের অনতিদূরে।

গেটসেমানি বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ। ভগবদচরণে উৎসর্গীকৃত কিছু জিতেন্দ্রিয় তপস্বী এখানে ভক্তি আর জ্ঞানমার্গের চর্চা করে চলেছেন। চৌষট্টী সালের অকটোবর মাসে যখন আশ্রমের দোরগোড়ায় দাঁড়াই, মনে হয়েছিল স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে এইখানে, এইখানে। জায়গাটার কথা আমায় বলেছিলেন ইনডিয়ানা ইউনিভারসিটির অধ্যাপক ফ্লয়েড আরপান। বলেছিলেন, তুমি ভারতের লোক, তোমার জায়গাটা ভাল লাগবে। ইউ উইল ফিল এট হোম দেয়ার। ফাদার লুই শুধু একজন পূজনীয় ব্রহ্মচারী নন, খ্যাতিমান সাহিত্যিকও। তাঁর রচনার বিস্তর প্রভাব এদেশের মানুষ ও রাষ্ট্রের মধ্যে। ওখানে যাও, ভাল লাগবে।

সত্যিই তাই। আশ্রম ঘুরে-ফিরে দেখে আমি যেমন মুগ্ধ, তেমনি মুগ্ধ আশ্রমগুরু ফাদার লুইকে দেখে। শ্বেতবসন, গলায় ঝোলানো ক্রস, বেটেখাট ছোট্ট মানুষ, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স, চোখেমুখে অতল প্রশান্তি। স্বাগত জানিয়ে বললেন, এখন আমি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন

নিয়ে পড়াশোনা করছি। ভালই হল, এই সময়ে একজন ভারতীয়ের উপস্থিতি আমার মনে প্রেরণা দেবে।

ফাদার ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালেন। চারদিকে গাছ-পালার সারি, ফুলের বাহার, আর কী বিস্ময়কর নীরবতা। এই নীরবতার ছেদ টানে প্রহরে প্রহরে মাপা উপাসনার সুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ, গির্জার ঘণ্টাধ্বনি।

আশ্রমের খামারেই উৎপাদিত হয় প্রয়োজনীয় সব শস্য, আশ্রমের গো-শালাই দেয় পিপাসা নিবারণের দুধ। এবং আশ্রমগুরুর ভাষায় এখানকার প্রধান কাজ—'টু কীপ এলাইভ ইন দি ওয়ালর্ড অব আওয়ার টাইম দি স্পিরিট অব সাইলেন্স্, প্রেয়ার লাভ অ্যানড্ পীস।' আশ্রমিক হতে গেলে হওয়া চাই ক্যাথলিক, বয়সে পনেরোর নিম্ন এবং অবিবাহিত। তার মধ্যে আবার নানা ভাগ—(১) কোয়ের মন্‌ক্-যাদের কাজ দিনরাত্রি নামগান করা (২) কোয়েব নোভিস —যারা আশ্রম ও গৃহে যাতায়াতের অধিকারী এবং (৩) ব্রাদার্স। তাছাড়া উইক এনড-এ আসেন ঈশ্বরপ্রেমী শান্তিকামী হাজার হাজার মানুষ। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার রাত অবধি কাটিয়ে গৃহাশ্রমে ফিরে যান।

স্থায়ী আশ্রমিকদের নিয়ে অন্তত সাড়ে চার ঘণ্টা করতে হয় কায়িক শ্রম এবং অন্তত আটঘণ্টা উপাসনা ও জ্ঞান চর্চা। সবাই মৌনী। আশ্রমের ভিতরে রয়েছে সাংকেতিক মুদ্রার প্রচলন। ডাক্তার কারিগর তড়িৎবিদ চর্মকার সব মিলিয়ে স্বয়ম্ভর জীবন। জরুরী কাজ ছাড়া আশ্রম ত্যাগ নিষিদ্ধ। শেষরাত দুটোর সময় শয্যাতাগের পর উপাসনা ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনবিদ্যা চর্চা এবং কায়িক শ্রমে ঠাসা সারাটা দিন। আশ্রমিক সকলেই নিরামিশাষী—একমাত্র খাদ্য ফলমূল পনীর সবজি দুধ।

ফাদার লুই শুরুতেই আশ্রমজীবন সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল করে দিলেন। তারপর আমার নানা প্রশ্ন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা। বললেন আপনাদের দেশের কেরল এবং মাদুরাইয়ে

এই রকম ছুটি আশ্রম আছে। আর আছে চিলিতে। ভারতের প্রতি আমার কিন্তু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। তার কারণ রয়েছে। আমাকে ভগবদমুখী করেছেন একজন ভারতীয় বাঙালী। তাঁর নাম মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। আমি খ্রীষ্টের সেবক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডঃ ব্রহ্মচারীই আমার গুরু। কলমবিয়া ইউনিভারসিটিতে উনি ছিলেন আমার সহপাঠী। ডঃ ব্রহ্মচারীর মধ্যে আমি দেখতে পেলাম একজন পরিপূর্ণ মানুষ, যিনি অন্তর্মুখী, ভগবদ্বিশ্বাসী এবং সত্ত্বগুণে ঐশ্বর্যবান। তিনিই আমাকে প্রভাবিত করেছেন এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠায়। তাছাড়া ভারতেরই একজন বৌদ্ধভিক্ষুর বাণী আমার জীবনের ও আশ্রমের মূল মন্ত্র। বোধিচর্যাবতার নামক গ্রন্থে শান্তিদেব এক জায়গায় বলেছেন "অন্যের সুখে সুখী হলেই, নিজেকে সুখী মনে করবে। অন্যের অসুখেই মনে করবে তোমার অসুখ। চমৎকার কথা।"

ফাদারকে বললাম, "আমাদের দেশের আর একজন মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ওই একই কথা একটু ঘুরিয়ে বলেছেন—'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' এবং এই কৃষ্ণই হচ্ছেন ভগবান। ''কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।"

"ঠিক তাই"—ফাদার আমার কথার খেই ধরে বলেন—"ওটাই হচ্ছে আমার মতে ভারতীয় আদর্শের মূলকথা। এবং সেই কারণেই দরিদ্র ভারত ধনী আমেরিকা বা সুইডেনের চেয়ে অনেক বেশি সুখী। মনুষ্য সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রাচ্যের দান—জ্ঞান। পাশ্চাত্য দিয়েছে—বিজ্ঞান। পূর্বদেশ অন্তর্মুখী ভিতরে তাকায়। কিন্তু পাশ্চাত্যের দৃষ্টি বাইরে। তাই সে অসুখী, তাই সে এই বিলাস বৈভব, এত জাগতিক ঐশ্বর্য সত্ত্বেও নিজেকে চেনে না। এবং এই না-চেনাই তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে পতনের দিকে ধ্বংসের মুখে।"

সেই সময় মারকিন মুলুকে চলছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের লড়াই। জনসন বনাম গোলড্ওয়াটার। ফাদারকে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই

বললেন—"ব্যারি গোলড্ওয়াটার যদি হোয়াইট হাউসে যায়, তাহলে সে হবে সাংঘাতিক ব্যাপার, হবে মনুমেণ্টাল ট্র্যাজেডি।"

ফাদার আরও বললেন—"কম্যুনিজম নিয়ে এত ভয় কেন মারকিনীদের? ওতে ভয়ের কী আছে? কুড়ি বছর আগে যে কম্যুনিজম ছিল এখন কি তাই আছে? না নেই। রাশিয়া, চীন, কিউবা, যুগোশ্লাভিয়া সর্বত্র তার রকম আলাদা। তাই যদি হয়, তাহলে একটিমাত্র ছাপ মেরে তাকে দেখে মূর্চ্ছা যাওয়া কেন? সত্যি কথা বলতে গেলে আমার এই আশ্রমই হচ্ছে সত্যিকারের একটি কম্যুনিস্ট স্টেট। কেন না এখানকার সাধুদের যা রোজগার, তা যায় যৌথভাণ্ডারে। আমাদের কারও আইনত কোন সম্পত্তি এই আশ্রমে নেই।"

ফাদার একটু থামতেই জানতে চাইলাম ও'র নিজের জীবনের কথা। একটু হেসে বললেন, 'আমার অতীত জেনে কী হবে, এই আশ্রমেই আমার সব, এখানেই আমি মানুষ গড়ার কাজে হাত দিয়ে শান্তিতে আছি। আমার জন্ম ১৯১৫ সালে ফ্রান্সে। মা বাবা মৃত, যুদ্ধে মারা গেছেন দাদা। ১৯৩৪ সালে আসি আমেরিকায়। কলমবিয়া ইউনিভারসিটিতে ছিলাম দর্শনের ছাত্র। আগেই বলেছি সেখানেই আলাপ আপনার দেশের ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে, যিনি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। শখ ছিল আপনারই মত সাংবাদিক হবার। কিন্তু তা আর হল না। কবিতা ও ছোট গল্পের বই আছে দু চারখানা, তার একটি অনুদিত হয়েছে তামিল ভাষায়। ১৯৪১ সাল থেকে এখানে আছি। এখন এই আশ্রমই আমার সব। পারিবারিক কোন সম্পর্ক নেই।"

ফাদারের কাছে জানতে চাইলাম এযুগের বড় সমস্যা কী? তৎক্ষণাৎ উত্তর—"আর কিছু নয়, আর কেউ নয়, বড় সমস্যা আমরা, —মানুষ। মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী যন্ত্র। সেও ভয়াবহ। কিন্তু বর্তমান মানব-সমাজের মত আতঙ্কজনক আর কিছু নেই। এযুগের মানুষ কক্ষচ্যুত, লক্ষ্যহীন। তাই সে নিজেকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না, এই

পৃথিবী তার কাছে নিরর্থক। তবে হ্যাঁ, আমি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাইনি। তার সদবুদ্ধি জাগ্রত করার ব্রত নিয়ে আমি বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চাই।"

ফাদারের কথার সূত্র ধরে আমি বললাম—"আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন, মানবের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।"

"কার কথা বললেন? রবীন্দ্রনাথ? ইউ মিন টেগোর?"—ফাদার উদ্ভাসিত মুখে বললেন—"টেগোর তাই বলেছেন নাকি? টেগোর ইজ গ্রেট। কিন্তু বড় দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি তাঁর লেখা বিশেষ আমি পড়িনি। সম্প্রতি পড়তে শুরু করেছি তার 'ন্যাশনালিজম' বইখানা। আমার মনের মত অনেক কথা আছে এই বইয়ে। ঠিক করেছি টেগোরের সব বই পড়ে শেষ করব।"

কথায় কথায় ইতিমধ্যে এক ঘণ্টা পার। ফাদারের কার্যসূচী মাপা। আমার মেয়াদ শেষ। এবার বিদায়ের পালা। ফাদারকে নিমন্ত্রণ জানালাম ভারতবর্ষে যাবার। বললেন, সুযোগ ও সময় এলে নিশ্চয়ই যাবেন। এবং আমার খাতায় সস্নেহে নিজের গৃহী-নামের (টমাস নারটন) অটোগ্রাফ দিয়ে লিখলেন 'উইথ করডিয়েল ফ্রেনড্শিপ টু এন ইনডিয়ান ভিজিটর।'

ধীরে আশ্রম ছেড়ে বেড়িয়ে এলাম প্রশস্ত রাজপথে। সেখানে লুইভিলগামী গ্রে হাউনড্ বাসের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা। আমার মন কিন্তু পিছনে। বাস, পথ, গতি সব মিথ্যে। মনের ভিতরে কেবল আশ্রম গির্জার উপাসনা—ঘণ্টা বাজছে। আমি আর আমেরিকায় নেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছি।

শেষ সংবাদঃ অমিয় চক্রবর্তী মশায়ের এক চিঠিতে জানতে পারলাম, আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কয়েক বছর পর ব্যাংককে এক দুর্ঘটনায় লুইবাবা মহাপ্রয়াণ করেছেন।

## আলবের্তো মোরাভিয়া

মোরাভিয়ার সঙ্গে আলাপ নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী অধিবেশনে। বোম্বাইয়ে।

সম্মেলনে নানান দেশ থেকে এসেছেন গুণীজ্ঞানীর দল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাহিত্যিকরা তো আছেনই, রুশ, জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, ইরাণ, মিশর, স্পেন, এমন কি কিউবা, চিলি, ইথিওপিয়া পর্যন্ত বাদ যায় নি। পুরোপুরি সাহিত্য মেলা। ১লা জানুয়ারী থেকে ৩রা জানুয়ারী ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের অধিবেশন-মণ্ডপ ছিল অষ্টপ্রহর জমজমাট।

এ মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন আলবের্তো মোরাভিয়া। ইতালীর জনপ্রিয় লেখক। মোরাভিয়া কবে আসছেন কখন আসছেন জানার জন্য সম্মেলন সচিব সলিল ঘোষকে সবাই জ্বালিয়ে মেরেছেন। সবাই মোরাভিয়ার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্য উৎসুক। অথচ বলতে দ্বিধা নেই, বক্তা হিসেবে সবচেয়ে বেশী হতাশ করেছেন এই মোরাভিয়া।

সম্মেলনে ভাল ভাল বিদেশী বক্তা এসেছেন অনেক। বৃটিশ কবি রিচার্ড চার্চ, 'স্যাটারডে রিভ্যুর' সম্পাদক নরম্যান কাজিনম, পেনসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক নর্ম্যান ব্রাউন, মার্টিন ক্যারল, ট্রুম্যান, এলমহার্স্ট প্রভৃতি আরও অনেকে। কিন্তু মোরাভিয়ার দিকে সকলের বেশী নজর পড়ার কারণ বোধ করি এদেশে তার লেখা বইয়ের জনপ্রিয়তা। তিনি চেনা লেখক। ভারতের বাজারে তাঁর বইয়ের কাটতি প্রচুর। মোরাভিয়ার, 'উয়োম্যান অব-রোম' এদেশের যুবক সমাজের মুখে মুখে।

মোরাভিয়া প্রথম দিন আসেন নি। এলেন ২রা জানুয়ারী বিকেলে। সন্ধ্যায় মণ্ডপে বলরাজ সাহানীর দলের হিন্দী 'কাবুলিওয়ালা'

অভিনয় হচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি কালো কোট, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং বাঁকা হাসি নিয়ে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক খুড়িঁয়ে খুঁড়িয়ে আসছেন সামনের আসনের সারিতে। সলিল ঘোষ আলাপ করিয়ে দিলেন—"এই হচ্ছেন মিস্টার মোরাভিয়া।"

পাশে বসে একথা সেকথা। মোরাভিয়া জানালেন, তাঁর নতুন বই 'ব্ল্যাংক ক্যানভাসের' কথা। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করেন নাটকটি কোন ভাষায় অভিনয় হচ্ছে? লেখাই বা কার?

বললাম—"রবীন্দ্রনাথের। অভিনয়ের ভাষা হিন্দী।"

"তাগোর- তাহলে হিন্দীতেই লিখেছেন?" মোরাভিয়া আবার প্রশ্ন করেন।

এবার আতঙ্কিত হই। রবীন্দ্রনাথ কোন ভাষায় লিখেছেন, তাও জানেন না, অথচ এদিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে এসেছেন এখানে? মুখে অবশ্যি বললাম—"এটি রবীন্দ্রনাথের এক বাংলা ছোট গল্পের হিন্দী নাট্যরূপ, রবীন্দ্রনাথ বাংলাতেই লিখেছেন।"

মোরাভিয়া আবার প্রশ্ন করেন—'ভারতে তাহলে অনেকগুলি ভাষা?'

"আজ্ঞে।" —আমার জবাব।

"কেন?" —আবার প্রশ্ন।

আমি আর জবাব না দিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে রবীন্দ্র সাহিত্য ব্যাখ্যার অধিবেশনে মোরাভিয়া বক্তৃতা দেবেন। আমার মত অনেকের মনেই এক কথা. 'দেখি মোরাভিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী বলেন।' কারণ মোরাভিয়ার সঙ্গে আলাপের পর কারও কারও স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, মোরাভিয়া এবারই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেন। অনেকের মনে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যদি তাঁর জ্ঞান না থাকে, তবে নেমন্তন্নই বা কেন? আন্তর্জাতিক পি-ই-এন-এর সভাপতি বলেই কি?

মোরাভিয়ার জন্ম ১৯০৭ সালে। রোমে। বাবা ছিলেন স্থপতি। ন'বছর বয়েস থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত ভোগেন অসুখে। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে শিখে নেন ফরাসী জার্মান ও ইংরেজী। ১৯২৫ সালে

মোরাভিয়া যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখেন, তখন তিনি তুরিণের দুটি খবরের কাগজের লণ্ডন সংবাদদাতা। ১৯২৯ সালে তাঁর লেখা বই 'টাইম অব ইনডিফারেন্স' নাম করে। অবশ্যি ১৯৪৭-এ প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'উয়োম্যান অব রোম' প্রথম জনপ্রিয়তার রেকর্ড করে। বইটি তিরিশটি ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে, মার্কিন দেশেই বিক্রি হয়েছে, এক লাখের বেশী। তাঁর লেখা ১১ খানি বই ইংরেজিতে বেরিয়েছে।

মোরাভিয়া নিজেকে বলেন ক্রিটিক্যাল রিয়্যালিস্ট। আলাপ-কালে প্রসঙ্গক্রমে জানান ইতালীর আর দশজন লেখকের মত তিনিও বামপন্থী, তবে কম্যুনিস্ট নন।

মুসোলিনীর আমলে মোরাভিয়ার বই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। তখন তিনি প্রবন্ধ লিখতেন ছদ্মনামে। জার্মান আধিপত্যের সময় তিনি পালিয়ে যান। আত্মগোপন করেন এক পাহাড়ে। দেশে ফেরেন ১৯৪৪ সালের মে মাসে।

মোরাভিয়া ইংরেজী বলেন পরিষ্কার। ধীর স্থির। আলাপী তো বটেই।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য শাখার অধিবেশনে বক্তা অনেক। হিন্দি সাহিত্যের দিক্‌পাল জৈনেন্দ্র কুমার, মারাঠী সাহিত্যিক বোরখার, বাংলাদেশের প্রমথ বিশী, কানাডার সীতা রামাইয়া, অন্ধ্রের ডঃ সীতা-পতি, উড়িষ্যার কালিন্দী চরণ পাণিগ্রাহী, গুজরাটের উমাশংকর যোশী, পূর্ব পাকিস্তানের জসীমউদ্দীন ত আছেনই আরো আছেন পূর্ব জার্মানীর ডঃ হাইৎস মোদে, চেকোশ্লোভাকিয়ার দুশান জ্যাভিটেল, মার্কিন দেশের মার্টিন ক্যারল এবং আরও অনেক।

বক্তার তালিকা দীর্ঘ। বক্তাদের অনেককে নিয়ে আবার সমস্যা। নির্ধারিত সময় বেরিয়ে যায়। বক্তৃতা থামে না। কার্য্যসূচী বানচাল হয়-হয়। সভাপতি চিট্ পাঠিয়ে পাঠিয়েও কম্বুকণ্ঠী বক্তাদের নিরস্ত করতে পারেন না। গত চারটি অধিবেশনে এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছে

এইদিনের অধিবেশনেও যথারীতি বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলেছে। একজনের পর একজন আসছেন আর রবীন্দ্রনাথের নানা দক উদঘাটিত হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো, যিনি যে বিষয়ে ওস্তাদ, সেইদিকেই রবীন্দ্র প্রতিভাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ইটালীর এঞ্জেলো মোরেরটা সংকট দর্শনের ছাত্র, তিনি শংকরাচার্য্যকে টেনে আনলেন তার রবীন্দ্র-নাথ সংক্রান্ত বক্তৃতায়। পূর্ব জার্মানীর ডঃ মোদে প্রাক্-ঐতিহাসিক ভারত সম্পর্কে বাঘা পণ্ডিত। তিনি রবীন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে গেলেন মহেঞ্জদারো এবং এক শৃঙ্গী ষাঁড়ের চৌহদ্দীতে।

যাইহোক, সবাইর প্রতীক্ষা মোরাভিয়া কি বলেন। চেকোশ্লো-ভাকিয়ার কুশান জ্যাভিটেল বাংলায় কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের তাক্ লাগিয়ে দিলেন। হাত তালির পর হাত তালি। এবার মোরাভিয়ার বক্তৃতা।

মোরাভিয়া এলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। দাঁড়ালেন মাইকের সামনে। তুবার কাঁধ নাচালেন, তিনবার কাশলেন তারপর কি যেন বলতে শুরু করলেন। বক্তৃতার বিষয় কিছু বোঝা গেল না। শোনা গেল শুধু কয়েকটি শব্দ ডেমোক্রাসি, ইণ্ড্রাস্ট্রিয়েলাইজেশন, ইউনিটি, তাগোরে ইত্যাদি। ব্যস, বক্তৃতা শেষ। সবাই এর মুখে ওর মুখে তাকান কী বললেন মোরাভিয়া।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলুন আর নাই বলুন মঞ্চ থেকে নামতেই স্বাক্ষর শিকারারা তাঁকে ছেঁকে ধরল। এগিয়ে গেলেন তুচারজন উৎসাহী তরুণ। উঠতি সাহিত্যিক কয়েকজনও। সবার দাবী আলাপ করতে চাই। মোরাভিয়া কাউকে নারাজ করেন না। বলেন আসুন তাজ হোটেলে, সেখানেই আছি।

বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা মহিলা সাহিত্যিকও ছুটে গেলেন মোরাভিয়ার কাছে। বললেন, "আমি অমুক অব বেঙ্গল। আলোচনা করতে চাই।"

মোরাভিয়া——"আপনি কী ভাষায় লেখেন? হিন্দি না ইংরেজিতে?"

ভদ্রমহিলা—"বললাম যে, আমি অমুক অব বেঙ্গল সুতরাং বাংলা-তেই লিখি।"

মোরাভিয়া—"ও দ্যাটস্ গুড।"

সাহিত্যালোচনা ওই খানেই শেষ। তবে দুজনের জোড়া ছবি তুললেন বাংলা দেশের আর একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক।

মোরাভিয়া ফিরে গেলেন তাজমহল হোটেলে। সেখানেও অপেক্ষা করছে স্বাক্ষর শিকারীরা। সাহিত্য রসিকরা খুশী না হোক ওরা হয়েছে।

## শান্তিনিকেতনে চু-এন-লাই

চৌ নয় চু—নিজের নামের উচ্চারণ নিজেই শুধরে দিলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী। তারপর 'উদয়নের' লালসিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দোতালায়। স্বল্পক্ষণের ভোজনান্তিক বিশ্রাম। ৩০শে জানুয়ারী তুপুর তুটো।

সকাল নটা থেকে হাসি ঠাট্টায়, গল্প-গুজবে সারা শান্তিনিকেতন মাতিয়ে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই। সংগীত ভবনে ছোট মেয়েদের সঙ্গে মন্দিরা বাজিয়ে নেচেছেন, কিচেনে চেটেপুটে খেয়েছেন ডাল ভাত রুই মাছের কালিয়া। ছাত্রছাত্রীদের ডেকে ডেকে এনে ছবি তুলিয়েছেন একসঙ্গে আর কারণে অকারণে ছড়িয়ে দিয়েছেন ঠোঁটের হাসির ঝিলিক! শান্তিনিকেতন থেকে চলে যাবার পরও সে হাসি গেথে আছে সেখানকার অনেক ছাত্রছাত্রী কর্মীদের মনে!

গত ১৫ই জানুয়ারী বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তনে উপস্থিত থাকার কথা ছিল চু-এন-লাইয়ের। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন মনীষীর সঙ্গে চু-এন-লাইকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত করে বিশ্বভারতী। জরুরী কাজের তলবে চু-কে সে সময়ে থাকতে হয় মস্কো। তাই চীন ও ভারত তুই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে একসঙ্গে দেখার তুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলেন শান্তিনিকেতনবাসীরা। ঐ সমাবর্তনে পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীনেহেরু।

চু-কে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর তোড়জোড় মাঝপথে থেমে যায়। নিরাপত্তা রক্ষার হাঙ্গামা হুজ্জুত থেকে রেহাই পেয়ে পুলিসের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আর শান্তিনিকেতনের লোকেরা মনমরা হয়েও ক্ষীণ আশার জাল বোনে। যদি পরে আসেন।

হঠাৎ খবর আসে কাঠমাণ্ডু থেকে কলম্বো যাওয়ার পথে একদিনের জন্য শান্তিনিকেতন যাবেন চু-এন-লাই। ঊনত্রিশে জানুয়ারী এসে ত্রিশেই ফিরবেন। আবার তোড়জোড়, আবার শামিয়ানা খাটানো, বাটিকের কাজ করা রঙবেরঙের কাপড় বের করা, আলপনার জন্যে রঙ গোলা, ফুলের মালা গাঁথা, স্বেচ্ছাসেবকের তালিকা তৈরী করা। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন। চু-এন-লাইকে সম্বর্ধনা জানিয়ে দেওয়া হবে বিশ্বভারতীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধি।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বিধুশেখর শাস্ত্রী ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ইতিপূর্বে এই উপাধি পেয়েছেন মাত্র তিন জন,—নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন ও পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ ফ্রাংকলিন রুজভেল্টের পত্নী মিসেস ইলিনর রুজভেল্ট। মিসেস রুজভেল্ট পান সর্বপ্রথম। ১৯৫২ সালে। তাও এমনি এক বিশেষ সমাবর্তনে। 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রাপ্ত দুই বিদেশীর মধ্যে একজন বিশিষ্টা মার্কিন মহিলা অন্যজন কম্যুনিস্ট চীনের কর্ণধার। রাজনীতির লড়াইয়ের মধ্যেই লাঠালাঠি। এখানে দেশের উপাধি প্রাপ্তদের তালিকায় কিন্তু পূর্ণ সহ-অবস্থান।

খবরের কাগজের আফিস থেকে আমার উপর ভার-পড়েছে চু-এন-লাইয়ের শান্তিনিকেতন যাত্রার সঙ্গী হতে। একে শান্তি-নিকেতন, তার উপর চু-এন-লাই। আমি যে যাবার নাম শুনেই এক পায়ে খাড়া।

চু-এন-লাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম ঘোরাঘুরি গত ডিসেম্বর মাসে। পুরো একটা দিন কাটিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে। একসঙ্গে গিয়েছিলাম বরানগর স্টাটিসটিকেল ইনস্টিট্যুটে আর মহাবোধি সোসাইটি ও স্কুল অব ট্রপিকেল মেডিসিনে। তখনই তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহল ও অমায়িক সহজ ব্যবহার দেখে আকৃষ্ট হই।

তাঁর অনুসন্ধিৎসার ঠেলায় সেবার আমাকে নাকানি-চোবানিও কম খেতে হয়নি। নানা জিনিস সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ও ঘুরে ঘুরে দেখার

সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমার হাঁটু ভাঙ্গার যোগাড়। বরানগরে তিনি ছুটে বেড়ান এ-বাড়ি ও-বাড়ি দোতলা তিনতলা। তিনি চলেন লিফটে। আমি ভাঙ্গি সিঁড়ি। তিনতলা উঠতে না উঠতে লিফ্‌ট নামে দোতলা। দোতলা যেতে না যেতে লিফ্‌ট ওঠে পাঁচতলা। অবস্থা কাহিল। তবু সঙ্গ ছাড়িনি।

সেবারে চু-এর কাছে এক ধমকও খাই। 'স্কুপ' ফসকাবার তুর্ভাবনায় নাছোড়বান্দা আমি পেছনে পেছনে লেগেই আছি। বরা-নগর ছাড়ার আগে তিনি প্রশান্ত মহলানবীশকে ডাকেন নিভৃতে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কেও। আমিও এগিয়ে গুটিশুটি দাঁড়িয়ে আছি। শুনছি তাদের কথাবার্তা। চীন থেকে এখানে ছাত্র পাঠানোর সলা-পরামর্শ। কি একটা সংখ্যা টুকতে গিয়ে যেই না কাগজ কলম বের করেছি, চু-এর মুখের মিষ্টি হাসি কোথায় গেল মিলিয়ে। ভুরু কুঁচকে ইংরেজীতে বলেন—'এখানেও তুমি। প্রেসের লোকদের জ্বালায় আর পারি না।' —ডাঃ রায় তাকালেন কটমট করে। তাঁর বাক্য-স্ফূর্তির আগেই আমি পঞ্চাশ গজের ফারাকে।

ধমক খেয়েও আনন্দ হল। যাঁর তাঁর কাছে নয়, চু-এন-লাইয়ের কাছে—যার ধমক খাচ্ছেন রাজনীতিক জগতের অনেক হোমরা চোমরা। শান্তিনিকেতনের পরিবেশে চু-এন-লাইকে কেমন লাগে দেখতে আমিও ছুটলাম শান্তিনিকেতন। উনত্রিশে জানুয়ারী সকালে।

চু-এন-লাই সদলবলে শান্তিনিকেতন এলেন ত্রিশে জানুয়ারী সকাল সওয়া ন'টায়। আগের রাত কাটিয়েছেন বোলপুরে। স্পেশাল ট্রেনের সেলুনে। তাঁর সঙ্গে আছেন চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মার্শাল হো-লুং। দলের লোকজন ছাড়া আর এসেছেন ভারতের সহকারী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ এবং ভারতে চীনের রাষ্ট্রদূত।

শান্তিনিকেতনে চু-এন-লাই ছিলেন মাত্র ছ'ঘণ্টা। তার মধ্যে জয় করে নিলেন সারা শান্তিনিকেতনের হৃদয়। তবে এই সঙ্গে নেহেরু থাকলে হত সোনায় সোহাগা। শুধু মাত্র রাজনীতিরক্ষেত্রে নয়

ব্যক্তিগত জীবনেও দুজনের মধ্যে চারিত্রিক মিল আশ্চর্যরকমের। রাজনীতির কুটিল ঘূর্ণাবর্তে দেশের নানা সমস্যার সমাধানে ব্যতিব্যস্ত থাকলেও সাহিত্য, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি সুকুমার কলার প্রতি তাঁদের দুজনের আগ্রহ অসাধারণ। দুজনেই আনন্দে অধীর হন শিশুদের দেখলে। সহজেই মিশে যেতে পারেন দশজনের ভীড়ে, হৃদয় জয় করতে পারেন অমায়িক আন্তরিকতায়। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে এলে মন্ত্রের মত কাজ করে এখানকার পরিবেশ।

১৯৪২ সালে চীন দেশ থেকে জেনারেলেসিমো চিয়াং কাইশেক যখন সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন তখন নেহেরু আসেন দিন দুই আগে। নিজেই নেন অভ্যর্থনার অনেকখানি ভার। এবার একটা তারবার্তায় নিজের অনুপস্থিতির দুঃখ জানিয়েছেন। বিশ্বভারতীর আচার্য হিসেবে চু-কে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শে বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্বভারতী তা আমাদের সবসময় স্মরণ করিয়ে দেয়। চু শান্তিনিকেতনে থাকা কালেই নেহেরুকে এই তার-বার্তার উত্তর পাঠান।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জায়গা হয় উদয়নের বারান্দায়। বাইরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে শামিয়ানা খাটিয়ে তৈরী হয় হাজার দেড়েক লোকের জায়গা। আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন অনুষ্ঠান না করা সম্পর্কে আচার্য শ্রী নেহেরুর আক্ষেপ উপেক্ষা করে আবার অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় সেই উত্তরায়ণের ঘেরা চৌহদ্দীতে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার আগে চু-এন-লাই মিনিট দশেক জিরিয়ে নেন উদয়নের বৈঠকখানায়। উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে জিগ্যেস করেন এখানে কি কি পড়ানো হয়, সায়ান্স, কদ্দূর আছে ইত্যাদি। হঠাৎ বলেন, 'আপনি নিজেও তো একজন সায়ান্টিস্ট; তাই না?' উপাচার্য হেসে বলেন,—'ইয়েস আই এম এ ফিজিসিস্ট—অ্যাণ্ড ওল্ড ফিজিসিস্ট।'

শীতের সকাল। সূর্যের প্রসন্ন আলো ঝিলিক মারছে য়্যুকলি-পটাস গাছের পাতায়, উত্তরায়ণের ফুলবাগানে। মাঘের সূর্য

উত্তরায়ণে পার হয়ে এল চলি। হলদে চাদর গলায় তদারকী করছেন বিশ্বভারতীর কর্মীরা। সামনে শান্তিনিকেতনী মণ্ডপকলায় বৈশিষ্ট-পূর্ণ অনুষ্ঠান মণ্ডপ। সুদৃশ্য আলপনা ধুপের সুগন্ধি ধোয়া। সকাল সাড়ে ন'টা। বেজে উঠল শাঁখ। চু-এন-লাই এসে বসলেন সমাবর্তন মণ্ডপে। পাশে উপাচার্য সত্যেন বসু। চীন ভবনের অধ্যাপক তান য়ুন শানের মেয়ে তান চামেলি বাটিকের কাজ করা শাড়ি পরে, খোঁপায় ফুল গুজে চু-এন-লাইকে পরিয়ে দিল চন্দন তিলক, রঙীন ফুলের মালা। শাঁখের গম্ভীর আওয়াজ থেকে শুরু হয় বৈদিক মন্ত্রগান—'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।' অনুষ্ঠান মণ্ডপ নিশ্চুপ।

আমি তাকিয়ে থাকি চু-এর মুখের দিকে। এই সেই চু-এন-লাই—নীল গলাবন্ধ কোট, প্যাণ্ট, কালো কুচকুচে চুল, ঝকঝকে উজ্জ্বল টানা টানা দুটো চোখ, ওষ্ঠে স্মিত হাসি। চোখেমুখে বিনয় নম্রতা ও সংস্কৃতির ছাপ। দেখেই মনে হয় না, এই নম্রতা প্রয়োজন মত রূপান্তরিত হয় ইস্পাতের কঠিনতায়। এই সেই চু-এন-লাই কূট রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে গোটা পৃথিবীতে যাঁর এত নামডাক, নিদ্রামগ্ন এক বিশাল ভূখণ্ড জাগরণের যিনি অন্যতম নেতা।

১৮৯৮ সালে বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিবান মান্দারিন পরিবারে তাঁর জন্ম। বাল্যজীবনে শিক্ষালাভ করেন নানকাই ও তিয়েনৎসিন বিদ্যালয়ে। বৃত্তির টাকায় চালান পড়াশোনার খরচ! ১৯১৯ সালে ছাত্রবিক্ষোভের নেতারূপে হয় এক বছরের জেল। জেলেই আলাপ হয় আর একজন ছাত্রনেত্রীর সঙ্গে। তার নাম তেং ইং চাও। পরবর্তী জীবনে তিনিই হন চু'র সহধর্মিনী।

জেল থেকে বেরিয়ে চু-এন-লাই গেলেন ফ্রান্সে। সেখানেই তিনি দীক্ষা নেন কম্যুনিজমে। চীন দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ফ্রান্স থেকে জার্মানী ইংলণ্ড ঘুরে তিনি ফিরে এলেন দেশে। ১৯২৪ সালে। এসেই যোগ দেন ডাঃ সুন ইয়াৎ সেনের জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে। তারপরের ইতিহাস কেবল

সংগ্রামের, দুর্জয় প্রাণশক্তির। ১৯৪৯ সালে চীনের মুক্তি অভ্যুত্থানের পর থেকে তিনি একাধারে তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী। চীনের সেই প্রসিদ্ধ ৬ হাজার মাইল লঙ মার্চের অন্যতম নেতা ছিলেন চু-এন-লাই।

ছোট বেলায় তিনি ছিলেন একজন পাকা অভিনেতা—স্ত্রী ভূমিকায় তাঁর অভিনয় নাকি ছিল অনবদ্য। ১৯১৪ সালে নানকাই কলেজে পড়ার সময় তিনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। দীর্ঘ কালো দুটি চোখের চাউনিতে আর পাতলা ঠোঁটের মিষ্টি হাসিতে মন ভোলান উপস্থিত দর্শকদের। আজও সে হাসি মিলিয়ে যায়নি।

উপাচার্য সত্যেন বসু একটি ক্ষুদ্র ভাষণে স্বাগত জানিয়ে হাতে তুলে দিলেন 'দেশিকোত্তম' উপাধিপত্র; পরিয়ে দিলেন বাটিকের চাদর। সম্বর্ধনার উত্তরে চু-এন-লাই বললেন বড় সুন্দর। বিরাট বক্তৃতা। চীনা ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন তাঁর দোভাষী। চীনের মুক্তিসংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি, চীন-ভারত মৈত্রী দৃঢ় করতে বিশ্বভারতীর নিরলস চেষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বললেন, বিশ্বভারতী ও ভারতের জনসাধারণ চীনদেশের জনসাধারণের প্রতি যে প্রগাঢ় মৈত্রী পোষণ করে থাকেন, আমি এ সম্মান তারই অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করছি। এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের জনসাধারণ আমাকে যে সম্মান দেখালেন তার যোগ্য হবার জন্যে আমি আরও কাজ করার শিক্ষালাভ করব। সবশেষে বলেন রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সমগ্র বিশ্বের গর্বের বস্তু। এখন বিশ্বভারতীর একজন ছাত্ররূপে আমিও এই গর্বের ভাগী হলাম।

সমাবর্তনের ঠিক পরেই আসর বসে উদয়নের বৈঠকখানায়। বৈঠকখানা ঘিরে রবীন্দ্রনাথ আঁকা রঙিন ছবি। তাকিয়া হেলান ফরাস আর সোফা ডিভানের অপূর্ব সম্মেলন। পেছনে বৌদ্ধমূর্তি।

চু-এন-লাই, হো-লুং ছাড়া মান্যগণ্যদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅনিল কুমার চন্দ, ভারতে চীনের রাষ্ট্রদূত, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক

সত্যেন বসু অধ্যাপক তান য়ুন শান, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, প্রতিমা দেবী, রানী চন্দ। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে হাসিঠাট্টায় গল্পগুজবে জমে ওঠে এই আসর। আমরা কয়েকজনও ঘুরঘুর করি কথাবার্তার পেছন পেছন। চীনা ভাষার বিরাট শব্দভাণ্ডার ছেঁকে আমার ছুটি মাত্র চীনে কথা জানা। 'নি হাউ পু হাউ' আর 'শেই শেই'। অর্থাৎ কিনা 'কেমন আছেন' আর 'ধন্যবাদ'। ভাবলাম এই ছুটো শব্দের পুঁজি নিয়ে চু-কে তাক লাগিয়ে দিই। কিন্তু আলাপের শেষ ধাক্কা সামলানোর ছুর্ভাবনায় শেষপর্যন্ত সাহস হল না।

তার আগে চু-এন-লাই পরিচয় করেন নন্দলাল বসু ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে নন্দলাল আজকাল বাইরে বিশেষ বেরোন না। কোন উৎসব অনুষ্ঠানে তো নয়ই। নিতান্ত আকস্মিকভাবে তিনি এই সমাবর্তনে এসে উপস্থিত হন। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন চীনদেশে যান তখন নন্দলাল সঙ্গে গিয়েছিলেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনও ছিলেন সেই ভ্রমণের সঙ্গী, কিন্তু বার্ধক্যের চাপে সমাবর্তনে আসতে পারেননি। নয়ত তাঁকেও দেখা যেত এই অনুষ্ঠানে; অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণরত আচার্যের আসনে।

হরিবাবুও আসেন কোনক্রমে লাঠি ভর করে। আশ্রমের প্রবীণতম কর্মীরূপে চু-এর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন অধ্যাপক সত্যেন বসু। বার্ধক্যের ভারে অবনত এই জ্ঞানতপস্বী উঠে দাঁড়াতেও পারলেন না। পরম শ্রদ্ধাভরে চু তাঁর হাত ছুটো জড়িয়ে ধরলেন। এই পরিচয়দানের সময় উপাচার্য সত্যেন বসু কথা বলছিলেন ফরাসী ভাষায়। চু বললেন—আপনি ইংরেজিতেই বলুন, আমি ছাড়া আমার দলের আর কেউ ফরাসী ভাষা বোঝে না। ইংরেজীতে বললে দোভাষী চীনে ভাষায় অনুবাদ করবে, দলের সবাই বুঝবে। তারপর থেকে সত্যেন বসু বরাবর ইংরেজীতে কথা বলেছেন। চু ফরাসী, জার্মান, রুশ ও ইংরেজি ভাষা বেশ ভাল জানেন। প্রায়ই তাঁকে দেখা গেছে ইংরেজীতে কথা বলতে। তবে বলেন কম।

উদয়নের বৈঠকখানায় ঢুকেই তান চামেলিকে জিজ্ঞেস করেন—"তোমার দিদি কোথায় ? তান ওয়েন ? তাকে ডাকো।

তান ওয়েন তান সাহেবের বড় মেয়ে। ছোট বেলা থেকে বিশ্বভারতীর ছাত্রী। বর্তমানে এম, এ পড়ছে বাঙলায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তান ওয়েনের মত জ্ঞান কম বাঙালীর মেয়েরই আছে। ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর বি-এ পরীক্ষায় বাঙলা অনার্সে তানওয়েন হয় প্রথম। কথাবার্তায় পোশাকে পরিচ্ছদে, চালচলনে খাঁটি বাঙালিনী! মাস কয়েক আগে বাবার সঙ্গে মাতৃভূমি চীনদেশ বেড়িয়ে এসেছে। সে সময় পিকিঙে চু-এর সঙ্গে তার আলাপ। চু শান্তিনিকেতন ছাড়ার আগে উপাচার্যকে বলে গেছেন—তান ওয়েন এম-এ পাশ করলে তাকে বৃত্তি দিয়ে চীন নিয়ে যাবেন।

তান ওয়েনকে দেখেই চু তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেন। বলেন—কবে পাশ করছ তুমি এম-এ ? তাড়াতাড়ি চলে এস চীনে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা অধ্যাপকের পদ তোমার জন্যে খালি রেখে দিয়েছি যে। আর হ্যাঁ, তোমার উপর অনেক কাজের ভার দেব। রবীন্দ্রনাথের লেখা খাস বাংলা থেকে অনুবাদ করতে হবে তোমাকে। চীনে অনুবাদ অনেক আছে। কিন্তু সে-সব ইংরেজী থেকে। আমি বাংলা থেকে চাই। তা যদি করতে পার তবেই বিশ্বাস করব তুমি বাংলাতে এম-এ, পড়ছ। কী রাজী ?

এমন সময় রাণীদি ( রাণী চন্দ ) এগিয়ে এসে বলেন, দেখুন প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই মেয়েকে কিছুদিনের জন্যে দিতে পারি, চিরদিনের জন্যে অসম্ভব।

রবীন্দ্রসদনের অধ্যক্ষ শ্রীক্ষিতীশ রায় চীনের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলবলকে নিয়ে যান রবীন্দ্র সদনে, উদয়নের দোতালায়। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত বহু মূল্যবান জিনিস নূতন করে সাজানো হয়েছে এই রবীন্দ্রসদনে। চু প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। টেবিল থেকে তুলে নেন 'শেষ লেখা' বইখানি, অনিমেষ তাকিয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত জোব্বার দিকে, লেখার কলমের দিকে, রঙ্

তুলির দিকে। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথকে লেখা স্থন ইয়াৎ সেনের একখানা চিঠি দেখে থমকে দাঁড়ান। ভাল করে পড়েন। চীন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'চু চেন তাং' উপাধি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে যে পদক দেওয়া হয়েছিল সেটি নেড়ে চেড়ে ভাল করে দেখেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে 'কত অজানারে জানাইলে তুমি' কবিতাটির চীনা অনুবাদ। কবিতাটি বার বার পড়েন। ঘুরে ফিরে বলতে থাকেন ঐ পঙক্তিটি—"দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।"

চু রবীন্দ্রসদন দর্শনে মগ্ন। এমন সময় ঘড়িতে বাজে ঢং ঢং করে এগারোটা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন চুপ করে। দলের সবাইকে বলেন, চুপ করে দাঁড়াতে, দু'মিনিট নীরবতা পালন করতে। আজ যে শহীদ দিবস। ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী লক্ষ লক্ষ শহীদের স্মৃতিতে এই শ্রদ্ধানিবেদন। শত কাজের ভিড়ে থেকেও এই বিশেষ দিনের কথা চু ভুলে যান নি।

রবীন্দ্রসদন থেকে সোজা লাইব্রেরি। ভারত-চীনের জোড়া পতাকা উড়িয়ে ছুটে চলে চু-এর গাড়ি। সামনে মোটর সাইকেল পাইলট, পেছনে আরও একসার গাড়ি। আমাদের গাড়িটা সবার পেছনে।

সেদিন বুধবার। শান্তিনিকেতনের সাপ্তাহিক ছুটি। চু-কে দেখানোর জন্যে কয়েকটি বিভাগ মাত্র খোলা। লাইব্রেরি থেকে চীনভবন। আবার সেই গাড়ির পালের ধাওয়া।

চীন সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত এই চীনভবন। চীন-ভারত সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার একমাত্র স্থান। চীনভবনে আছে হাজার পঞ্চাশের উপর বই। তার অনেকগুলিই দুষ্প্রাপ্য। খাস চীন দেশেও নেই। এখানে কাজ করেছেন অনেক চীনা অধ্যাপক, গবেষক। ভারতীয় গবেষক, ছাত্রও আছেন। অন্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও চীনা ভাষা, তিব্বত শিখেছে।

প্রাচীনকালে চীনা পণ্ডিতরা এদেশে এসে বহু সংস্কৃত পুঁথি চীনা ভাষায় অনুবাদ করে সঙ্গে নিয়ে যান। কালের পরিবর্তনে মূল সংস্কৃত

পুঁথি গেছে হারিয়ে, টিঁকে আছে কেবল ঐ চীনা অনুবাদ। চীনাভাষা চর্চা করে নিরলস সাধনায় এখানকার গবেষকরা সে পুঁথিগুলি পুনরুদ্ধার করছেন সংস্কৃতে। প্রতিবছর এমনি উদ্ধারকার্য চলেছে, বেরোচ্ছে মূল্যবান প্রবন্ধ। আর এখান থেকেই প্রকাশিত হয় চীন-ভারত সম্পর্কে গবেষণার ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'সিনো ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ।' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় পরলোকগত উপাচার্য ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। তিনি পরে এই ভার বিশ্বভারতীর হাতে সমর্পণ করেন। এই প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করি ডাঃ বাগচির দান। ভারত-চীন, ভারত-তিব্বত সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আর কেউ নেই।

গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ এই চীনভবনে। বাইরে ভেতরে সব জায়গাতেই। তাছাড়া বারান্দায় নন্দলালের করা সেই অপূর্ব ভিত্তিচিত্র—নটীর পূজার দৃশ্যাবলী, ভেতরে হলঘরে 'ধ্যানী বুদ্ধের মারবিজয়' দৃশ্যের দেয়ালজোড়া বিরাটকার ভিত্তিচিত্র। অজন্তার অনুকরণ।

চীনভবনের দোরগোড়ায় আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছি। চু গাড়ি থেকে নেমেই যুক্ত করে নমস্কার করতে করতে এগোন। এমন সময় দু'টি মেয়ে এগিয়ে বলে, আমরা ছবি তুলব আপনার সঙ্গে। তান সাহেব তাদের বাধা দেবার আগেই চু হেসে বলেন—'দাঁড়াও সবাই আমাকে ঘিরে।' ফটোগ্রাফারদের ডেকে বলেন—'ছবি তুলুন।'

'দোতালায় উঠতে গিয়ে চু দেখেন সামনে লেখা আছে ভিজিটার-দের জুতো খোলার অনুরোধ। চু জুতো খুলতে যান। তান সাহেব বলেন—ঠিক আছে, আপনাকে রেহাই, দেওয়া গেল। চু তবু বলেন, খুলে নিলেই তো ভাল। তানসাহেবের পীড়াপীড়িতে শেষমেষ জুতো নিয়েই তিনি ঢোকেন। সেখানে পরিচয় করেন চীনভাষা শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। ভারতীয় ছাড়া অনেক বিদেশীও ভর্তি হয়েছেন চীনাভাষায়। তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে।

টেবিলে সাজানো ছিল অনেক বই। তার মধ্যে একখানি

বগলদাবা করে চু তানসাহেবকে বলেন, এটি আমি নিলাম। বইটি চীনাভাষার, তানসাহেবেরই লেখা ভারত ভ্রমণের উপর। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

নীচের তলায় একটি ঘরে সাজানো ছিল কলা, লেবু, আপেল, হরেক রকমের ফল। একটি কমলালেবু তুলে নিয়ে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আবার ওঠেন গাড়িতে। এবারে কলাভবন।

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মূল ছবি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো কলাভবন। আর আছে ক্রাফট্স বিভাগের নানা কাজ, চীনাশিল্পী জু পেঁয়র আঁকা বিখ্যাত ঘোড়ার ছবি ইত্যাদি।

অবনীন্দ্রনাথের আঁকা বিরাটাকার 'আলমগীর' ছবিটি চু দেখেন অনেকক্ষণ। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট আলমগীর। বার্ধক্যের ভারে, দুশ্চিন্তায় ঈষৎ ন্যুব্জ, পেছনে দু' হাত নিয়ে ধরা কোরান, জপের মালা। কোরানের ভিতর তলোয়ার। চোখে ক্রুর দৃষ্টি। মধ্যযুগের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এক মোগল সম্রাটের দিকে তাকিয়ে থাকেন বিংশ শতাব্দীর আর একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ গণনেতা।

চু-এন-লাই প্রদর্শনী দেখে গেছেন ভিজিটার্সদের খাতায় মন্তব্য লিখতে। এদিকে হো-লুং বাইরে বেরিয়ে নন্দনের বারান্দায় ঝোলানো নাদুস নুদুস এক 'গং' দেখে দুম দুম করে কিল মারতে থাকেন। গং গমগম আওয়াজে বেজে ওঠে আর তিনি হেসে গড়িয়ে পড়েন।

তারপর সংগীত ভবন। এখানেই এক বিরাট বিস্ময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। কথাকলি নাচের ক্লাশ অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে চু যান ওপাশের মণিপুরী নাচের ক্লাশে। পাঠভবনের ছোট মেয়েরা নাচছে গোল হয়ে। এক, দুই, তিন, চার, ধিন্‌তে ইৎ থা, খিৎ তা ধেইনতা—এক, দুই—ধিন্‌তে ইৎ থা—খোলের মিঠে আওয়াজের সঙ্গে ছোট মেয়েদের নূপুর-ধ্বনি। নাচের দুলুনিতে চু-ও দুলতে থাকেন, একজনের হাত থেকে কেড়ে নেন মন্দিরা। তারপর সবাইকে তাক লাগিয়ে তাল ঠিক ঠিক বজায় রেখে নাচের সঙ্গে বাজাতে থাকেন মন্দিরা—ঠুং ঠুং ঠুং। নাচের গতি বাড়ে, কমে,—মন্দিরাও

তার সঙ্গে পাল্লা দেয়। চু মাথা নাড়িয়ে হাত ঘুরিয়ে বাজান ঠুং ঠুং ঠুং। আশ্চর্য তাঁর তালজ্ঞান। সেটা অবশ্যি বোঝা গিয়েছিল সমাবর্তনের সময়ই। 'বিশ্ববিদ্যা তীর্থ প্রাঙ্গণ' গানের সময় বসে বসে তিনি আঙুলে বেশ তাল দিচ্ছিলেন। রানীদির কাছে শুনেছি ওঁরা যখন ১৯৫৫ সালে সাংস্কৃতিক দল নিয়ে চীন গিয়েছিলেন, চু দু-একবার তবলা বাজাতেও চেষ্টা করেছিলেন।

শুধু মন্দিরা বাজানো নয়, শেষমেষ তিনি মন্দিরা হাতে দাঁড়িয়ে পড়েন নাচের দলে। চু-কে মাঝখানে ঘিরে মেয়েরা দ্বিগুণ উৎসাহে নাচ চালিয়ে যায়। খোলে বাজে—ঘিন খেরে খেরে তাং খেরে খেরে তাং ঘিৎ—চু হাতে বাজান মন্দিরা, তালে তালে ফেলেন পা, আর মেয়েদের হাতের মুদ্রার অনুকরণে একবার হেলেন ডানদিকে একবার বাঁদিকে। দুই হাতে চু-এর মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে। উপস্থিত সবাই হতভম্ব। কোথায় শিখলেন তিনি নাচ? দূরে দাঁড়িয়ে হো-লুং পর্যন্ত হাসেন।

খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারদের দারুণ মওকা। এমন অপূর্ব দৃশ্য কদাচিৎ মেলে। চু-এন-লাইয়ের মণিপুরী নাচ। শুরু হল চারধার থেকে—ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্। তার মধ্যে একজনের ক্যামেরা হঠাৎ বেয়াড়াপনা শুরু করে। বালব্ শার্টার নিয়ে বেচরা ব্যতিব্যস্ত। চু তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন—'সো স্লো।' তাড়াতাড়ি করুন, আর নাচতে পারছি না।' পাক্কা দশ বারো মিনিট নেচে চু-এন-লাই হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। দলবল নিয়ে এবার সোজা শ্রীনিকেতন। ধুলো উড়িয়ে চলল গাড়ির কনভয়।

গ্রামোন্নয়ন কার্যে শ্রীনিকেতনের কাজের নানা চার্ট, শিল্পসদনের বিভিন্ন বিভাগ দেখার পর যাওয়া হল চীপ সাহেবের কুঠি-বাড়িতে। সেখানে জঙ্গল কেটে পত্তন হয়েছে নূতন বিভাগের। সমাজ শিক্ষা শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের আস্তানা। তখন সেখানে গাছতলায় হচ্ছিল গান্ধী-স্মরণ সভা। দূর থেকে ভেসে আসছিল গানের কলি—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে'—গান্ধীজীর প্রিয়

গান। চু অনুরুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যান সভায়। ছোট বক্তৃতায় বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের আশ্রম পরিদর্শনে এসে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—ভারতের এই দুই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার সুযোগ পেয়ে আমি সৌভাগ্যবান। এই দুই মনীষী সমগ্র বিশ্বের গর্বের পাত্র।'

দুপুর একটায় মধ্যাহ্নভোজ। উত্তরায়ণে হাত মুখ ধুয়ে চু ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এসে দাঁড়ান কিচেনের সামনে। এই প্রথম বোধ হয় একজন বিদেশী মান্য ব্যক্তির আহারের ব্যবস্থা হল কিচেনে। দু বছর আগে নেহরু কিন্তু হঠাৎ ঢুকে পড়েন এই কিচেনে। তখন পৌষমেলা। শালপাতা মাটির গ্লাসে খিঁচুড়ির ঢালাও ব্যবস্থা। ছাত্রছাত্রীদের মাঝখানে বসে পরম তৃপ্তিতে তিনি খেতে থাকেন খিচুড়ি, বেগুন ভাজা।

চু-কে কিচেনে খাওয়ানোর ব্যবস্থায় কিচেনের পরিচালকরা হিমসিম খেয়ে যান। তার সঙ্গে খাবেন বিশ্বভারতীর সব কর্মী! সংখ্যায় প্রায় সাড়ে চারশ। কিন্তু খাবার কী ধরনের হবে? বিলিতি রান্না? উঁহু। চীনে খাবার? উঁহু। তবে? এখানকার ঠাকুররা বাঙালী রান্না ছাড়া অন্য কিছু জানে না যে।—বেশ তাই হবে, খাঁটি বাঙালী রান্না—আতপ চালের ভাত, সঙ্গে একটু ঘি। তারপর কিছু একটা ভাজা। মাছ ভাজা? না, বেগুন ভাজাই থাক। আর থাকুক ফুলকপি, আলু, কিসমিস দিয়ে মুগডালের রান্না। মাছ যদি খাওয়াতেই হয় তবে রুইমাছ—রুইমাছের কালিয়া। সঙ্গে দিন টমেটোর চাটনি। আর হ্যাঁ, চিনিপাতা দই, নলেন গুড়ের সন্দেশ, ব্যস্।

উত্তর দিকে মুখ করে বসলেন চু। বাঁদিকের বড় হলঘরটায়। এক পাশে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, অন্য পাশে অধ্যাপক সত্যেন বসু ও অনিলকুমার চন্দ। উলটো দিকে দক্ষিণমুখী হয়ে বসলেন মার্শাল হো-লুং তানসাহেব, চীনা রাষ্ট্রদূত। বিশ্বভারতীর কর্মিদলের সঙ্গে এদিক ওদিক ছড়িয়ে বসলেন দলের অন্যান্য লোক।

খাওয়া প্রায় শেষ। আমরা কয়েকজন এগিয়ে গেলাম কোন্ রান্নাটা তাঁর ভাল লেগেছে জানতে। চু বলেন, সবই ভালো লেগেছে আমার। এই দেখো না থালা; কী সুন্দর চেটেপুটে খেয়েছি সব।

রুই-মাছের কালিয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন—দু' বাটি চেয়ে নিয়েছি।

তারপর কী খেয়াল হল, হঠাৎ বললেন—"দেখো, আমরা সবাই বলি, হিন্দি-চীনি ভাই ভাই—ওটা আমার পছন্দ নয়। আমি এবার থেকে বলব—'হিন্দি চীনি—ভাই বহিন, আজ থেকে এটাই হবে নূতন শ্লোগান।" তারপর হিন্দি-চীনি বলে নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন 'ভাই' আর মেয়েদের দেখিয়ে বলেন—'বহিন।' হিন্দি চীনি ভাই বহিন।

এখানকার তিব্বতী অধ্যাপক লামাজী ছিলেন আমার পাশে। তিনি আমাকে কানে কানে বলেন, অমিতবাবু, ভাই বহিন হোনেসে লেকিন এক মুশকিল হোগা। দোনো দেশমে সাদি বিলকুল বন্ধ।

ভাবলাম চু-এন-লাইয়ের কাছে লামাজীর এই আশঙ্কাটা পাড়ি। কিন্তু ততক্ষণে অধ্যাপক বসু দাঁড়িয়ে গেছেন ভোজনান্তিক ভাষণে। পরে চু-এন-লাই তার উত্তর দিতে দাঁড়ান। ক্ষুদ্র ভাষণ, অথচ অন্তরঙ্গতার স্পর্শ প্রতি শব্দে। চীনা দোভাষী সে সময় এগিয়ে আসতেই বলেন—না, তোমার এসে কাজ নেই। তান ওয়েন এদিকে এসো, আমার বক্তৃতার বাংলা দোভাষীর কাজ কর দেখি তুমি কেমন বাংলা শিখেছ। আমি চু-কে বলি—বরং বলুন, দেখব কদ্দূর তুমি মাতৃভাষা মনে রেখেছ।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি চু 'বাঙলা' শব্দটিকে সব সময় উচ্চারণ করেন 'মাঙলা'।

খাওয়ার পর চু-এন-লাই গেলেন বিশ্রামে। মার্শাল হো-লুং তখন পায়চারি করেন উদয়নের বারান্দায় আর চুরুট টানেন। সুগঠিত বলিষ্ঠ চেহারা, চোখে মুখে দৃঢ়তার ছাপ। হো-লুং এতক্ষণ বিশেষ পাত্তা পাননি। তিনি নিজেই ছিলেন পেছন পেছন।

মার্শাল হো-লুঙের জীবনও বৈচিত্র্যময়। বয়সে চু-এন-লাই থেকে বছর দুয়েকের বড়। ১৮৯৬ সালে জন্ম। এই হো-লুং নাকি একটিমাত্র ছোরা নিয়ে তাড়া করে হুনান প্রদেশের গোটা একটা জেলা দখল

করেছিলেন। চীনবাসীর কাছে হো-লুংএর বীরত্ব রূপকথার মত তিনি সেখানে পৌরাণিক বীরের মত পূজ্য।

হো-লুঙের পিতা ছিলেন 'চিং' রাজবংশের একজন সামরিক অফিসার। ছোটবেলাকার তাঁর নির্ভীকতার অনেক গল্প আছে। আর শোষক জমিদাররা তাঁকে এমন ভয় করত যে ৫০।৬০ মাইল দূরে তিনি আছেন জানলেই তারা ভয়ে পালাত। বিখ্যাত 'লংমার্চে' হো-লুংও ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি মার্শাল উপাধিতে ভূষিত হন। বর্তমানে তিনি চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী।

চু-এর অনুপস্থিতির সুযোগে হো-লুং আসর বসান উদয়নের বারান্দায়। চু-এন-লাই সদলবলে একটু পরেই ছেড়ে যাবেন শান্তি-নিকেতন। ছাত্রছাত্রীরা বিদায় জানাতে একে একে জড় হচ্ছে উত্তরায়ণে। ইলাদেবী চট্টোপাধ্যায় নামে এম এ ক্লাশের এক ছাত্রী যাচ্ছিল হন্‌হন্‌ করে। হো-লুং তাকে থামিয়ে দিয়ে ইসারায় বলেন, একটু নাচ দেখাবে? হো-লুং ইংরেজি বলতে পারেন না। ইলাদেবী তকখুনি রাজি। মিনিট দুই নেচে দিল ভরতনাট্যম। হো-লুং চেয়ার টেনে বসেন আর অনুকরণ করেন নাচের মুদ্রা। ইতিমধ্যে ছোট বড় অনেক ছেলেমেয়ে জড় হয়ে গেছে উদয়নের বারান্দায়। ভরতনাট্যম্‌ থামে। হো-লুং বলেন, আরও কিছু হোক। ছেলেরা গান ধরে, ছোট ছোট মেয়েরা নাচে। "ওগো নদী আপন বেগে পাগলপারা", 'আর নাই যে দেরী" ইত্যাদি। এদেরও নাচের নেশায় পেয়ে বসেছে। শুরু করে দিল 'চণ্ডালিকা'। নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য। হো-লুং এর পাশে দাঁড়িয়ে, তান ওয়েন, তান চামেলি বুঝিয়ে দেয় চণ্ডালিকার মূল কথা, গানের কথা।

"রাজবাড়িতে বাজে ঘণ্টা
ঢং ঢং ঢং
ঐ যে বেলা বয়ে যায়।
"কাজ নেই কাজ নেই মা
কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়"।

নাচগানের আসর শেষ হতে না হতেই চু নেমে এলেন দোতলা থেকে। বিদায়ের আর দেরি নেই। সামনে গাড়ি প্রস্তুত। উত্তরায়ণের সদর ফটক পর্যন্ত লাইন বেঁধে দাঁড়াল শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা। চু সবার সঙ্গে করমর্দন করেন। উপাচার্যকে বলে যান, চীনভবনের জন্যে পাঠাবেন বই, বিশ্বভারতীর জন্যে ষাট হাজার টাকা। চীনা ভাষায় ডিপ্লোমাধারী ছাত্রছাত্রীদের চীনে গিয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা করার প্রস্তাবে সানন্দে জানান সম্মতি। ইন্দিরা দেবীকে দিয়ে গেলেন উপহার—ফুলদানি, স্ক্রল, বুককেস্ অনেক কিছু। এমন সময় অনিলদাকে বলেন—'আচ্ছা একটা খোলা জীপে চড়ে স্টেশন গেলে হয় না? শান্তিনিকেতনের বাড়িঘর, গাছপালা লোক-জনদের যাবার আগে ভাল করে দেখে যেতে চাই।'

অনিলদা বললেন, 'তাই হবে।' খোলা জীপে লাগানো হল ভারত-চীনের জোড়া পতাকা।

চু আর হো—দু'জনে এসে দাঁড়ান উদয়নের বারান্দায়। যুক্তকরে। সারা দিনের আনন্দোৎসবের পর শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার আগে মুখে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণতার ছাপ। ততক্ষণে গান শুরু হয়ে গেছে—"আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন।" চু আর হো নমস্কার করতে করতে গিয়ে ওঠেন গাড়িতে। গাড়ি স্টার্ট দেয়—কুড়ি পঁচিশটি গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দ ছাপিয়ে গানের আওয়াজ ভেসে বেড়ায়—

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে,
সে যে যায় না কভু দূরে।"

চু-এন-লাইয়ের গাড়ি উত্তরায়ণ পেরিয়ে যায়। পেছন থেকে তাড়া করে গানের সুর—"ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক মন"। চু-এন-লাই পেছন ফিরে তাকান। হাত নাড়েন।

ছাতিমতলার পাশ দিয়ে বেণুকুঞ্জ, খেলার মাঠ, চীনভবন, শিশু বিভাগ পেরিয়ে গাড়ি ভুবনডাঙার পথ ধরে।

'প্ল্যাটফরমে স্পেশাল ট্রেন দাঁড় করানো। আশেপাশে লোক-

জনের ভিড়। বিদায় জানাতে এসেছেন অধ্যাপক সত্যেন বসু। তান সাহেব, অনিলদা, রানীদি সঙ্গেই যাবেন। আর এসেছে তান-ওয়েন, তান চামেলি। চু-এন-লাই আলাপ করছেন সত্যেন বসুর সঙ্গে। তাঁকে চীনে যাবার নেমন্তন্ন জানাচ্ছেন বার বার। এমন সময় হো-লুং, তান ওয়েন আর তান চামেলিকে বলেন, 'তোমরাও চলো কলকাতায়।' কিন্তু ফেরা যায় কী করে, গায়ে এক জামাকাপড়, শীতের কিচ্ছুও নেই, তার উপর খালি পা। নাছোড়বান্দা হো-লুং কোন ওজর আপত্তি শোনেন না, তাদের টেনে তোলেন গাড়িতে। এমন সময় অনিলদা বলেন, প্রাইম মিনিস্টার, মার্শাল হ্যাজ কিডন্যাপড টু ইয়াং গার্লস্। সত্যেন বসু বলেন, 'দে আর দি ফ্রুটস্ অব্ মার্শালস্ ভিক্টরি।'

চু দাঁড়িয়েছিলেন কামরার দোরগোড়ায়। অনিলদার' কথা শুনে উচ্ছ্বসিত হাসির দমকে ফেটে পড়েন। বলেন—'কিডন্যাপ' কথাটা বেশ জুৎসই বসিয়েছেন মিঃ চন্দ।'

যাই হোক, তানওয়েন, তান চামেলি ওঁদের সঙ্গে চলল। লাভের মধ্যে কলকাতায় নেমেই তাদের জুটল দু'পাটি নতুন জুতো। চু কিনে দিয়েছেন।

গাড়ি ছাড়ার সময় হল। চু নেমে আমাদের সবার করমর্দন করেন। বলেন—কাটিয়ে গেলাম পরম আনন্দময় একটা দিন। শান্তিনিকেতনের কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। শান্তিনিকেতন বোলপুর পেছনে রেখে ট্রেন এগোয়। চু দরজায় দাঁড়িয়ে কেবল হাত নাড়েন, আর ফিরে ফিরে তাকান। 'যেতে যেতে চায় না যেতে ফিরে ফিরে চায়।'

## ন্যাট কিং কোল

লস এঞ্জেলেসে থাকতে অসুস্থ দেখে এসেছিলাম, দেশে ফিরে কাগজে পড়লাম ন্যাট কিং কোল মারা গেছেন। বিলিতি গান-বাজনা ভালো বুঝিনে, কিন্তু যাঁদের যাঁদের গলা আমার ভালো লাগে, কোল তাদের একজন।

খবরটা পড়ে খারাপ লাগল। আরও খারাপ লাগল এই কারণে যে মৃত্যুর অল্পদিন আগে কোল-এর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আমি তখন লস এঞ্জেলেসের লাগোয়া সান্তা মনিকার ইভনিং আউটলুক কাগজে কাজ করি। কখনও কালিফোর্নিয়ার নতুন সেনেটর মার্ফির প্রেস কনফারেন্স 'কভার' করতে যাই, কখনও যাই আদালতে মার্লোজ ব্রাণ্ডো আর আনা কাশফির মামলা শুনতে। হঠাৎ একদিন কাগজের ম্যানেজিং এডিটর রন ফাংক বললো—"অমিত, আমাদের ফটোগ্রাফারের সঙ্গে হাসপাতালে যাবে নাকি? তোমার ফেবারিট ন্যাট কিং কোল চিকিৎসা করতে এসেছে।"

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। আগের দিন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের ষ্টুডিওয় আমার আর একজন ফেবারিট প্যাট বুনের সঙ্গে আলাপ করে এসেছি, ভালই হল কোল্-এর সঙ্গে এবার দেখা হয়ে যাবে।

সেণ্ট জন হাসপাতালের সামনে খানিক অপেক্ষা করার পর কোল বেরিয়ে এলেন। শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ। পাশে হাতে হাত জড়ানো স্ত্রী মারিয়া।

ছবি তোলা মুহূর্তে শেষ করে ইভনিং আউটলুকের ফটোগ্রাফার

আলাপ করিয়ে দিলেন—'চডুরী ফ্রম ইণ্ডিয়া"। আমি বললুম, "রিয়েল ইণ্ডিয়ান"। কোল মৃত্বু হাসলেন। বললেন, "ওদিকে আমার যাওয়া হয়নি।"

"তা না যান, আমাদের দেশে আপনার অনেক ভক্ত আছে"—আমি নিবেদন করলুম।

"তাই নাকি ?—"

কোল-এর কথা শেষ হল না। স্ত্রী মারিয়া তাঁকে টেনে নিয়ে গাড়িতে তুললেন। আর দেরি করা চলে না, চারদিকে ভিড় জমে যাচ্ছে। ন্যাট কিং-কোলের গুণগ্রাহী সর্বত্র এবং বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে তার পেছন পেছন ধাওয়া করে। অসুস্থ স্বামীকে এই ধকল সইতে দিতে মারিয়া নারাজ।

মারিয়ার ভয় পাবার কারণ সত্যিই আছে। কোল জনপ্রিয় গায়ক। ছেলেমেয়েরা তাঁর নামে পাগল। এবং মার্কিন দেশে এই পাগলামি কদ্দুর যায় সে অভিজ্ঞতা তাঁদের দু'জনেরই আছে।

এই পাগলামি অবশ্য অকারণ নয়। ন্যাট কিং কোল গত ক'বছর খ্যাতির শীর্ষে। ইদানীং টেলিভিশন, নাইট ক্লাব, থিয়েটার আর রেকর্ড থেকে তাঁর বার্ষিক আয় কুড়ি লাখ টাকা। শো-বিজনেসে বেশী টাকা পাওয়ার রেকর্ডও তাঁর। লাস ভেগাসের এক হোটেল তাঁকে এক বছর পঁচিশ লাখ টাকা দিয়েছিল।

কোল-এর আদত বাড়ি আলাবামায়। জন্ম ১৯১৯ সালের ১৭ মার্চ। কোল-এর বয়স যখন পাঁচ, তাঁদের পরিবারের সবাই চলে আসেন শিকাগো। গান বাজনার দিকে তাঁর ঝোঁক ছেলেবেলা থেকেই। ইস্কুলে পড়তেই তিনি নিজের একটি দেড় ডলারের ব্যাণ্ড তৈরী করেন।

তাঁর পুরো নাম নাথানিয়েল অ্যাডামস কোলস্।

"কিং কোল ট্রায়ো" যখন পরে তৈরী হয়, তখনই পদবীর কোলস্ থেকে 'এস' অক্ষর তিনি বাদ দেন। একবার নাইট ক্লাবের

এক ম্যানেজার তাঁকে চার জনের একটি দল তৈরী করতে বলেন। তিনি ভাড়া করলেন তিন গাইয়ে বাজিয়েকে এবং নিজে বসলেন পিয়ানোয়। একদিন দলের ঢাকী গরহাজির। সেদিন থেকে তিনি ওকে বাদ দিয়ে দলের নাম দিলেন 'কিং কোল ট্রায়ো।' কিং কেন? কারণ ওই নাইট ক্লাবেরই ম্যানেজার একদিন তাঁর মাথায় সোনালী কাগজের মুকুট পরিয়ে দিয়ে গানের রাজা বলে তাঁর পরিচয় শ্রোতাদের দেন। তারপর থেকেই নাথানিয়েল অ্যাডামস কোলস হলেন—'ন্যাট কিং কোল।'

কোল গোড়ার দিকে ছিলেন পুরোপুরি জাজ শিল্পী, ছিলেন আর্ল হাইনজ আর লুই আর্মস্ট্রংয়ের ধারাবাহী। নিউইয়র্ক টাইমস একবার তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন—

Cole has seen fit to make his transition complete so that in place of a pianist who also sing, he has became a singer who occasionally plays the piano

কোল-এর শরীর অনেকদিন থেকেই খারাপ যাচ্ছিল। ১৯৫৩ সালে একবার কার্নেগি হলের জাজের আসরেই পাকস্থলীর ঘায়ের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তারপর থেকেই একটা না একটা অসুখ। গলায় ক্যান্সারের কথা অনেকদিন জানা যায় নি। কোল অসুস্থ—এই কথাই মুখে মুখে ঘুরছিল গত ডিসেম্বর থেকে। সান্তা মনিকার সেণ্ট জন হাসপাতালে কোল কোবাল্ট থেরাপি বিভাগে চিকিৎসা করাতে গিয়েছেন, এই খবর বেরোনোমাত্র গোটা মার্কিন দেশে হই-চই। নানা গবেষণা—ক্যান্সার হয়েছে কি হয়নি।

এদিকে বেচারা মারিয়ার অবস্থা কাহিল। গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে দিনে গড়ে সাতহাজার করে চিঠি। সেই চিঠি বাছাই করার

জন্যে কোলকে রাখতে হয় আলাদা একজন সেক্রেটারি।

পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ডাক্তারদের স্থির সিদ্ধান্ত বিষণ্ণ মার্কিন জনসাধারণ শুনল কিছুদিনের মধ্যে। হ্যাঁ, কোল-এর দুরারোগ্য ক্যান্সারই হয়েছে।

তারপর ছ'মাসও পেরোয়নি। কোল-এর কণ্ঠ চিরকালের মত স্তব্ধ।

## পাতাল পুরী

সিঁড়ির পর সিঁড়ি—স্বর্গে যাবার নয়, পাতালের। আঁকাবাঁকা পথ, আধো অন্ধকার, নীচের দিকে নামছে আর নামছে। তার পরেই অন্ধকার নিরুদ্দেশ, চারদিকে আলোর ঝলমলানি, পাতালপুরীর বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে যায়।

সে এক আশ্চর্য রূপকথার দেশ। রূপালি ঝালর, মর্মর-মিনার আর স্ফটিকতোরণে অবিরাম বিদ্যুৎ-চমক। মণি-মরকত দেয়ালে দেয়ালে খিলানে খিলানে চোখ ধাঁধায়। মর্ত্যলোকের সব শোভা মুহূর্তে ম্লান। কখনও মনে হয় হারুন-উর-রশিদের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছি, কখনও মনে হয় ঘুরে বেড়াচ্ছি কালিদাসের কালের উজ্জয়িনীতে কখনও বা হাজির হই আদ্যিকালের রোমান এমফি-থিয়েটারে। সময় নামক যন্ত্রটি পিছু হটতে হটতে অতীত ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে থমকে দাঁড়ায়, আবার পিছিয়ে চলে। হাজার হাজার বছর পার হয়ে যায়, রূপময় নগররাজি রহস্যের ঘোমটা খুলে সিনেমার মনতাজের মত আসে আর মিলিয়ে যায়, অনির্বচনীয় এক অনুভূতি শিরশির শিরদাঁড়া বেয়ে সারা দেহে রোমাঞ্চ জাগায়।

পলকে পলকে পটবদল, পলকে পলকে বিস্ময়। কিন্তু বাদশাহের হারেমে বেগমসাহেবারা নেই, রাজপথে ঘুরে বেড়ায় না নিপুণিকা চতুরিকার দল। স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা হয়ত কোথাও কোন হীরকখচিত মর্মর প্রকোষ্ঠে ঘুমে অচেতন, রাজপুত্রের সোনার কাঠি সেই প্রকোষ্ঠের সন্ধান পায়নি অন্যেরাও তাঁর খোঁজ রাখে না। শুধু জনহীন স্তব্ধ এই রহস্যনগরীতে সামান্য হাসির শব্দ হা-হা অট্টহাসি হয়ে অলিন্দ থেকে অলিন্দে ছুটে যায়, প্রতিধ্বনি হয়ে আবার ফিরে এসে স্ফটিক-ঝালরে আর নীল সরোবরে দোলা লাগায়। মাঝে মাঝে ভয় ধরে, মনে হয় পালাই-পালাই, কিন্তু পথ কোথায়? নিস্ক্রান্তির সব দ্বারে খিল।

সময়ের চাকা আবার ঘুরে যায়। সম্বিৎ ফিরে আসে, ফিরে আসে লৌকিক জগতে। ইতিহাস, পুরাণ, রূপকথা—কোথাও আমি নেই, রয়েছি পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় 'ম্যামথ কেভ'-এর অতল গহ্বরে।

'ম্যামথ কেভ' অর্থাৎ 'বিশাল গুহা।' মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার কেনটাকি রাজ্যের ন্যাশনাল পার্ক এই গুহা। সেখানে এক যাওয়া যায় কল্পনায়, আর যাওয়া যায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় চারশ ফুট নীচে নামলে।

এই বিশাল গুহার আবিষ্কারও আকস্মিক। অনেকটা অজন্তা আবিষ্কারের মত। বাঘের পিছনে ছুটতে ছুটতে এক সাহেব-শিকারী যেমন গভীর জঙ্গলের মধ্যে অজন্তা-গুহার সাক্ষাৎ পেয়ে অবাক হয়ে যান, ঠিক তেমনি ১৭৯৮ সালে এক স্থানীয় শিকারী বন্য-বরাহের পিছু ধাওয়া করে বিশাল গুহার গোপন প্রবেশপথের সন্ধান পান।

তারপরেই একে একে খুলতে লাগল রহস্যের পর্দা। এ যুগের মানুষের কাছে উন্মোচিত হল অকল্পনীয় এক রূপময় জগৎ। ১৮৩৭ সালে কাজ শুরু হয় ভালভাবে। প্রধান প্রবেশপথের ভিতরে এগোতে এগোতে আবিষ্কৃত হল প্রাগৈতিহাসিক কালের অসামান্য সৃষ্টি—খেয়ালী প্রকৃতির নন্দন-কানন। স্টিফেন বিশপ নামে কেনটাকিরই একটি পনেরো বছরের ছেলে বিশাল গুহার, প্রথম গাইড। এই ছেলেটিই ভিতরের সুলুকসন্ধান জানতেন। একদল বিজ্ঞানীকে নিয়ে গিয়ে সে-ই সর্বপ্রথম শত সহস্র বৎসরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরিণাম প্রকৃতির ওই গোপন ঐশ্বর্য ভাণ্ডার খুলে দেয়।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, পঁচিশ কোটি বছর আগে কেনটাকি অঞ্চলে ছিল অগভীর সমুদ্র। সমুদ্রের তলানিগুলো জমে জমে হয় বেলেপাথর, স্লেট ও চুনাপাথর। তার দশ লক্ষ বছর পরে ভূ-পৃষ্ঠ উঁচু হতে থাকে, সমুদ্র সরে যায়, তলায় পাথরগুলো বেরিয়ে পড়ে। তারপর শত শত বছর ধরে ভূমির ক্ষয় আর নানা রকম ধাতুতে ধাতুতে মেশামেশি। অঙ্গারাম্লজান বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে হয় কারবলিক এসিডের সৃষ্টি

এবং ওই এসিড-মাখা মাটি থেকে চুয়ানো জল তলার চুনা পাথরের সঙ্গে মিলে বিশাল গুহার উদ্ভব। ওই জল গড়িয়ে গড়িয়ে গম্বুজাকৃতি অসংখ্য গহ্বরের সৃষ্টি করে। অন্য আরও দশটা ধাতুর সঙ্গে মিলল জিপসাম। ভূ-পৃষ্ঠ উঁচু হতে হতে বিশাল গুহা ক্রমেই চলে গেল মাটির তলায়। নানা আকারের বরফ-স্তূপ হয়ে গেল ফসিল। তৈরি হল জিপসাম, বেলেপাথর, স্লেট, চুনাপাথর আর ফসিলের তৈরি কিউবিক বাড়ি, করিডর, খিলান, গম্বুজ।

উপরের জল চুইয়ে চুইয়ে ক্রমাগত চেহারা পালটাতে লাগল— ভিতরের দৃশ্যসজ্জার। ফসিল-বরফ আর চুনাপাথরে দেখা দিল কারুকার্যময় নক্‌সা। কোথাও জমাট তুষারের মিনার, কোথাও ছুঁচের মত প্রলম্বিত ঝালরের সারি। চুনের সঙ্গে লোহা মিশে দেওয়ালের রঙ কোথাও বাদামী, আর জিপসাম মিশে এখানে ওখানে নকশা কাটা ফুলের পাপড়ি।

বিরাট এলাকা। লম্বায় মাইল খানেক, চওড়ায় অন্তত সিকি মাইল। উপর থেকে কিন্তু বোঝার উপায় নেই। সবুজ গাছ, ফুলের বাগান, পাখির ডাকের তলাতে যে এত আজব ব্যাপার লুকিয়ে আছে কে বলবে।

বছর ছয় আগে মারকিন মুলুকে টহল দিতে দিতে কেনটাকির ওই বিশাল গুহা দেখতে যখন আসি, প্রথম টের পাইনি সত্যি সত্যি এত বড় একটা জাদু-জগৎ মাটির তলায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

গাইড পাওয়া যায়। তাঁকে সঙ্গী করে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম। নামছি তো নামছিই। পথের আর শেষ নেই। পাথুরে দেয়াল স্যাঁতসেঁতে, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব; তিন'শ ফুট নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অন্য জগৎ। অন্ধকার নেই, স্যাঁতস্যাঁতে ভাব নেই, একেবারে গগন ঠাকুরের আঁকা বিশাল একখানা ছবি। জমাট তুষার জিপসাম, চুনা আর বেলেপাথর মিলে, আগেই বলেছি, রূপকথার জগতের এক একটা মহল। খানিক

উঠে, খানিক নেমে যতই এগোই, স্বপ্নলোকের দরজা একের পর এক খুলে যায়। প্রকৃতি যে কত সুনিপুণ কারিগর, বিশাল গুহার ওই ময়দানবিক কাণ্ড কারখানা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

বিজলির দৌলতে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা সর্বত্র। নানারকম মিশ্রণে ও লক্ষ লক্ষ বছরের সংগ্রহে আর ক্ষয়ে এক একটি দিক নিয়েছে এক একটি জিনিসের আকার কোনটি যেন সিংহদ্বার, কোনটি শয়নপ্রকোষ্ঠ, কোনটি রাজপ্রসাদের তোরণ, কোনটি পুষ্পোদ্যান। রাস্তা আছে, পুকুর আছে, ঘরদোর বাড়ি সব আছে এবং বিদ্যুতের আলো তার উপর পড়ে সব কিছু সব সময় ঝলমলায়। কে বলবে প্রাগৈতিহাসিক আদিম গুহা, যেন তেপান্তরের মাঠ পেরোনো ব্যাঙমা ব্যাঙমীর দেশ।

এলাকাওয়ারী নামও রয়েছে দ্রষ্টব্য জিনিসের। একদিকে ঐতিহাসিক প্রবেশ পথ—সেখানে একশ তিরিশ ফুট উঁচু রুজভেল্ট মিনার। তার তলায় পঁচানব্বই ফুট গভীর সাইলো খাদ। তার কাছেই এমফিথিয়েটার, মার্থা ওয়াশিংটন স্ট্যাচু। এবং ওইখানটাতেই দু'হাজার বছরের পুরানো এক মমী।

সবচেয়ে বিস্ময়কর, সবচেয়ে রহস্যময় এই মমী। সম্ভবত কোন রেড ইনডিয়ানের। সাহেবদের আসার অনেক বছর আগে থেকেই ওরা জানতো বিশাল গুহার খবর। দলে দলে তারা নীচে নামত মূল্যবান জিপসাম কুড়িয়ে আনতে। বহু দেয়ালে এখনও তাঁদের নখের আচড়ের দাগ। হয়ত এই মমীরূপী রেড ইনডিয়ানও জিপসাম কুড়োতে এসে কোন দৈব দুর্ঘটনায় মারা যায়। তারপর শত সহস্র বৎসর কেটে গিয়েছে, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ফসিল হয়ে অবনত দেহ নিয়ে গাছের টুকরোর মত মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার পরিচয় কেউ জানে না, তবু সে গুহাযাত্রী শত শত পর্যটকের প্রধান আকর্ষণ। হাত পা মুখ বুক পিঠ সব ধরা যায়, বোঝা যায়, পালাবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রুদ্ধ গুহার তলদেশে তিলে তিলে যন্ত্রণা সহ্য করে অবশেষে সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে।

গুহার অন্য প্রান্তে 'জমাট-নায়াগ্রা। বরফের স্তূপে স্তূপে নায়াগ্রা জল প্রপাতের স্থিরচিত্র। মাঝখানে ছড়িয়ে আছে সাহারা মরুভূমি, শেক্সপীয়ার এভিনিউ, গ্র্যানড ক্যানিয়ন', রক অব জিবরালটার এবং কী আশ্চর্য, 'ব্লাক হোল অব ক্যালকাটা! প্রকৃতি যেমন তেমন বানিয়েছে, আর মানুষ তারই আদল নিয়ে নিজের মত নামকরণ করেছে। নিরন্ধ্র ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ—সেটাই কলকাতার অন্ধকূপ।

কিন্তু সব ছাড়িয়ে যায় তিন শ' ষাট ফুট নীচে 'ইকো-রিভার'—প্রতিধ্বনি নদী। ছোট একফালি জায়গা, তাতে কাকচক্ষু জল। নদী না বলে সরোবর বললে ভাল মানায়। এবং সেই সরোবরে কয়েকটি মাছ, যার নাম 'ব্লাইনড ফিশ'। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অন্ধকার সরু গলি দিয়ে অনেক অনেক নীচে নামলে সাক্ষাৎ মেলে সেই ইকো নদীর। বিজলী আলো সেখানে নেই, লণ্ঠন হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে হঠাৎ টলটল তরল জলের দেখা মেলে। মনে হয় এই এলাকা যেন পাতালপুরীর পাতালপুরী। এবং অন্য সব স্থির, জমাট, শুধু ইকো নদীর জলধারায় প্রাণের প্রবাহ।

পুরো এলাকা একদিনে দেখা অসম্ভব। বেছে বেছে কয়েকটা জিনিস দেখতেই আমার পুরো তিন ঘণ্টা কাবার। এবারে ফেরার পালা, উত্তরণ। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাইরে এসে যখন দাঁড়ালাম, এক ঝলক সূর্যের আলো আর গরম হাওয়া সারা শরীর ধুইয়ে দিল। রূপকথার অলৌকিক জগৎ থেকে লৌকিক পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন। সামনেই অভ্রংলিহ অট্টালিকা প্রশস্থ রাজপথ, সুরম্য উদ্যান; কিন্তু বিশাল গুহা থেকে সদ্যোপ্রত্যাবৃত্ত আমার কাছে এই মূহূর্তে এই সব বড় অকিঞ্চিৎকর।

## হোটেলে বিপত্তি

তেহরান এয়ারপোর্টে নেমে চক্ষু চড়কগাছ। হোটেলে থাকা নিয়ে মহা বিপত্তি। শেষ রাত্তিরে প্যান-অ্যামের রাক্ষুসে জাম্বোজেটে পালাম ছেড়েছিলাম, ভোরে তেহরান—ইরানের ঝকমকে রাজধানী। রোদে আকাশ তামাটে, প্রকৃতি তামাটে এমন কি এয়ারপোর্টের গায়ে লাগা আল বুরুজ পাহাড়টাও তাই। সবুজ আর নীলের দেখাসাক্ষাৎ কদাচিৎ।

জাম্বো-রাক্ষসের পেট থেকে বেরিয়ে কাষ্টমস ভিসা পাসপোর্টের ঝামেলা চুকিয়ে সামনে এগোতেই দেখি ওয়াকি টকি হাতে কিছু ইরানী তরুণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের বুকপকেটে লেবেল 'হ্যাবিটাট'। আর একটু সামনে একটা এনক্লোজার তাতে অনেক আরবী হরফে ফারসি আর ইংরেজিতে হ্যাবিটাট লেখা। বুঝলুম, আমার আপাতত গন্তব্য ওই এনক্লোজার। আমার নাম বলতেই একজন কাগজপত্র ঘাটতে ঘাটতে বললেন—ও চৌধুরী, আপনার ব্যবস্থা হয়েছে ইণ্টারকনটিনেণ্টালে। ওই লিমুজিন নিয়ে চলে যান। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি নামের তালিকার কাগজে চৌধুরীর আগে এ নেই আছে বি ডি এন। আমার সন্দেহ হল, কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে ঠেলে পাঠাবেই। আমি যত বলি, আমার নাম এ চৌধুরী, ভদ্রলোক তত বলেন, দ্যাটস অল রাইট দ্যাটস অল রাইট। কিন্তু আমার সংশয় যায় না।

আমার সন্দেহ অমূলক নয়। ১৯৫৫ সালের জুন। ইউনাইটেড নেশনস তেহরানে আয়োজন করেছেন 'হ্যাবিটাট সেভেণ্টিফাইভ' নামে আবাসন নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ভারত থেকে অন্যতম প্রতিনিধি আমি। আর আছেন দিল্লী ডেভেলাপমেণ্ট অথরিটির

জগমোহন, কেন্দ্রীয় গৃহদপ্তরের যুগ্মসচিব জগন্নাথন আর আমাদের দলনেতা বিজ্ঞানী বি ডি নাগচৌধুরী।

পদবী চৌধুরী দেখেই আমাকে বি ডি নাগ চৌধুরী ভেবে বসে আছে ওরা। কিন্তু কাহাতক আর তর্ক করা যায়। তাছাড়া আমি না জানি ফারসি, ওরা না জানে ভাল ইংরেজি, জগত্যা লিমুজিন চেপে হোটেল ইণ্টারকনটিনেণ্টালে এসে হাজির। পেল্লাই হোটেল। যেমন জাঁকজমক, তেমনি হাঁকডাক। আমার পকেটে রিজার্ভ-ব্যাংকের মঞ্জুর করা সেই সাকুল্যে আট ডলার। আর এখানে থিতু হলে পা ইউ এনের কর্তারা দেবেন দিনে সাঁইত্রিশ ডলার। কর্তাদের তো পাত্তাই নেই। ভয়ে ভয়ে হোটেলে ঢুকলুম। আমার জন্যে আলাদা একটি ঘর ব্যবস্থা হয়ে গেল। সইসাবুদ করেও আমি আর ঘরে যাই না। হাউস লাউঞ্জে বসে এদিক ওদিক তাকাই আর ফোনে ধরবার চেষ্টা করি ইউনাইটেড নেশনসের কাউকে। কিন্তু টেলিফোন ডিরেক্টার থেকে নম্বর বের করা সোজা কাজ—গোটা বই যে ফারসিতে লেখা।

হোটেলের কাউণ্টারে একজনের সঙ্গে ভাব জমালুম। মাইডিয়ার লোক। একথা সেকথার পর জানতে চাইলাম, আমার ঘরের রোজ ভাড়া কত। সে ভাল ইংরেজি জানে, বললে ভেরি চীপ, ওনলি ফর্টি এইট ডলার।

তার মানে আমি পাব সাঁইত্রিশ ডলার। তার মধ্যে হোটেলে থাকা তিন বেলা খাওয়া গাড়িঘোড়ার খরচ—সব কিছু। সর্বনাশ। এই হোটেলের এই ঘরে থাকতে গেলে অন্তত ষাট ডলার চাই রোজ।

ইরাণী ভদ্রলোককে সব কথা খুলে বললুম। ইরাণ সরকারের ওয়াকিটকি হাতে তথ্য দপ্তরের এক কর্মচারীকেও পাকড়াও করলুম। কিন্তু কাজের বেলায় সবাই অষ্টরম্ভা। তথ্য দপ্তরের লোকটি আবার বলে, আর কোথায় যাবে, রাতে তোমার ঘরে খুবসুরৎ মেয়ে পাঠিয়ে দেব। বিউটিফুল গার্ল। ওই যে লাউঞ্জের এক কোণে কফি পার্লার

দেখছ না, সেখানে সন্ধ্যাবেলা যে-কটি মেয়ে এসে বসে, সবাই হোটেল অতিথিদের সন্ধ্যাসঙ্গিনী হতে চায়। তোমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দেব।

মাথা খারাপ আমি মরছি টাকার চিন্তায় আর উনি দেখাচ্ছেন মেয়েমানুষ। কিন্তু কতকক্ষণ আর লাউঞ্জে বসে থাকা যায়। দু'একটা ফোন করার ব্যর্থ চেষ্টা করে, সুটকেশ হাতে ঢুকে পড়লাম আটতলার সেই ঘরে। স্নান করলুম, জামা কাপড় পাল্টালুম, বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখলুম, তারপর ফিটফাট সেজে আবার নামলুম নিচে। কাউণ্টারের সেই লোকটিকে আবার ধরলুম ফোনে হ্যাবিটাটের কোন কর্তাকে ধরে দিতে। সে বেটা বলে, দূর কোথায় যাবে, তোমাকে আরো পাঁচ টাকা কনসেসন ক'রে দিচ্ছি, এখানেই রাত কাটাও, বিউটিফুল গার্লস, বিউটিফুল নাইট।

নিকুচি করেছে তোর বিউটিফুল গার্লসে। হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। আমার কাছে ইউনাইটেড নেশানসের তো নিমন্ত্রণ চিঠিটা রয়েছে। দেখি তো, তাতে কোন নম্বর টম্বর আছে কি না। ঠিক তাই, কনফারেন্সের পি আর ও'র নাম ও নম্বর রয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত হিলটন হোটেলে তাকে পেয়েও গেলুম। ওপার থেকে তার মার্কিনী গলা—মিস্টার চৌধুরী হোআর ইউ, তোমার জন্যে হোটেল কমোডোরে ব্যবস্থা আছে, ওখান থেকেই বলছ তো?

আমি আমার অসহায় অবস্থা জানাতেই চিৎকার পাড়লেন—ননসেন্স, দ্যাট ইরানিয়ান ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট ইজ রিয়েলি ওয়ার্থলেস। প্লীজ মুভ টু হোটেল কমোডোর। দি রুম ইন ইণ্টার-কন্টিনেটাল ইজ বুকড ফর মিষ্টার নাগচৌধুরী হি ইজ কামিং বাই টুমরোজ ফ্লাইট। ও কে, বাই বাই।

রিসিভার রেখে দ্রুত উঠে গেলাম হোটেলের ঘরে। সেখান থেকে সুটকেশ নামিয়ে এনে কাউণ্টারে বললাম, তোমাদের জন্যে আমার এই ফ্যাসাদ। লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আমি তো মাত্র আধ ঘণ্টা ঘরটায় থেকেছি কোন চার্জটার্জ করো না, আর সোনার টুকরো

ছেলে আমার হোটেল কমোডোর কি করে যেতে হয় তার রাস্তাটা বাতলে দাও।

ভদ্রলোক সদাশয়। তার বস-এর সঙ্গে কীসব পরামর্শ করে আমাকে টাকার দায় থেকে রেহাই দিলেন এবং লিখে দিলেন হোটেল কমোডোরের ঠিকানা তখৎ-ই জমশিদ এভিনিউয়ে। ট্যাকসি, রাস্তায় দাঁড়াও, হলুদ রঙের গাড়ি দেখলেই হাত দেখাবে। তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে।

তা'ই হল আমি শতকোটি সালাম জানিয়ে সুটকেশ হাতে বিদায় নিলুম এবং দাঁড়িয়ে পড়লাম। রাস্তা তো নয় ফুটবলের মাঠ। তারপর অতিকষ্টে একখানা ট্যাকসি ধরে সোজা কমোডোর। হাঁফছেড়ে বাঁচলুম। দেখলুম ব্যাঙ্ককের প্রতিনিধি অনুস্মরণ আর আমার ব্যবস্থা হয়েছে একঘরে। তেহরান এত এক্সপেনসিভ যে, সাঁইত্রিশ ডলার রোজ পেলে ফোরস্টার হোটেলের ঘর ভাগাভাগি করে না থাকলেও খরচে পোষাবেনা।

তেহরান ইদানীং নিউইয়র্ক টোকিওকে টেক্কা মারছে। খরচের ব্যাপারে। আমাদের যে ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে, তা নিউইয়র্কের হিসেবে, কিন্তু তেহরান নিউ ইয়র্কেরও বাড়া। তাছাড়া জিনিসপত্রের দামও সাংঘাতিক, আর শহর? তুলনা নেই। রাস্তার বাহার কী। দোকানের সারি। ফুটপাত। তারপর গাছের সারি। জলের জালা। আবার গাছের সারি। আবার ফুটপাত আবার গাছের সারি। তারপর বিরাট দশ লেনের রাস্তা এবং অন্যদিকেও সেই একইভাব ফুটপাত গাছ নালা গাছ ফুটপাত গাছ ইত্যাদি।

আমাদের কনফারেন্স বসত হিলটন হোটেলের গায়ে এক নতুন তৈরী বাড়িতে। বাসে নিয়ে যেত, ফিরিয়ে দিত। আমার হোটেলেই বেরিয়ে গেল এক পরিচিত। সৈয়দ মুজতবা আলির ভাইপো মুস্তাফা আলি। ম্যাজিলায় প্রেস ফাউণ্ডেশন অব এশিয়ার একজিকিউটিভ ডিরেক্টার। তাছাড়া পরিচয় হল রাউলপিণ্ডির ডন কাগজের বুরোচীফ মনসুরির সঙ্গে। তিনি কী চমৎকার বন্ধুবৎসল ভদ্রলোক। পাকিস্তানের

দুই প্রতিনিধিও সজ্জন। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তিনজন, ইউরোপ আমেরিকার বহু ডেলিগেট, কিন্তু আফ্রিকা আর পশ্চিম এশিয়ার প্রতিনিধিরাই বেশি। কুয়াইত, আবু ধাবি, সৌদি আরব, ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদি। চিবুকে ছাগলদাড়ি আর মাথায় ফেট্টি। জোমো কোনিয়াটার মেয়ের জামাই ছিলেন কেনিয়ার দলনেতা। দিল্লি থেকে এক্সপার্ট এসেছিলেন আশিস বসু। আমাদের অনিলকুমার চন্দের ভাগনে। আমার আগেকার পরিচিত। আমি তো তার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ। বেষ্ট স্পীকার।

কনফারেন্স বিকেলে শেষ হতেই সারা তেহরান ঘুরে বেড়াই। সঙ্গে আলি আর মনসুরি। জাদুঘরে দেখে আসি ময়ূর সিংহাসন। রাজারানীদের গয়নাগাটি, নতুন স্টেডিয়াম, নতুন নতুন বসতি। ইরানের শাহ বেশ টাকা ঢালছেন উন্নয়নের কাজে। আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন শাঠে বলে এক মারাঠী তার সঙ্গেও আলাপ হল এক পার্টিতে।

বিদেশে গেলে আমার বরাবরই গণ্ডগোল বাধে খাওয়া দাওয়া নিয়ে। তেহরানে সে গণ্ডগোল নেই। একদিনের সাক্ষাতেই আবিষ্কার করলাম ভাত আর মাংসের দোকান। ভেড়ার মাংস গরম ভাত চাটনি—আর কী চাই। আর ইরানের হাউসিং মিনিস্টার যেদিন পার্টি দিলেন, সেদিন তো খাওয়ার মেনু দেখেই আমি ফিট হয়ে যাই আর কি।

ইরানে তো সুখে কাটল কয়েকদিন। তেহরান থেকে কাবুল। সেখানেও হোটেল নিয়ে আবার বিপত্তি। এয়ারপোর্ট থেকে তো সোজা চলে এলাম সরকারী কাবুল হোটেলে। বিরাট তিনতলার হোটেল। কিন্তু ও হরি, খানিক বাদে আবিষ্কার করলাম তিনশ ঘরের এই হোটেলে একমাত্র অতিথি আমি। আর আছে ঠাকুর, চাকর, খানসামা, বাবুর্চি।

সেটা প্রথমে মালুম হয় ডাইনিং হলে গিয়ে। বিরাট হল। টেবিলে টেবিলে ছুরি কাটা প্লেট সাজানো, উর্দি পরা বেয়ারারা ঘুরে

বেড়াচ্ছে কেতা দুরস্ত। সংখ্যায় তারা অন্তত জনা চল্লিশ। আর খানেওলা একমাত্র আমি।

বসে আছি তো বসে আছি, চল্লিশজন বেয়ারার খিদ-মদগারে আমি অতিষ্ঠ। হঠাৎ দেখি হল ঘরের অন্য কোণে আর একজন এসে বসেছেন। সঙ্গে মহিলা। আমি আর এককোণে। এই নবাগতদের ভাল করে দেখতে হলে বাইনাকুলার দরকার। শুনলুম ওরা বাইরের লোক, হোটেলের বাসিন্দা নন।

দিন তো কাটল শহর ঘুরে। দেখতে পেলুম বাবরের সমাধি, খুব সুন্দর বাজার। মুজতবা আলির দেশে বিদেশে গিলে পড়া সেই বিখ্যাত বাজার। দেখলুম বর্ণানামাফিক ঠিক তেমনটিই আছে। খচ্চরের পিঠে নানারকম জিনিস—জামাকাপড় শাকসব্জি মশলাপাতি। খচ্চর চলাফেরা করে, দোকানদার খদ্দেরও চলাফেরা করেন, সওদাও হয়।

দূর দূর থেকে আসছে মালপত্র। ইয়া ইয়া দশাসই চেহারার সব পাঠান। মুখের জবান এক একটি যেন তোপের আওয়াজ। কাবুলের বাজারে দেখলাম সব্জি টাটকা রাখার সুন্দর পন্থা। আমাদের দেশের বাজারগুলোতে যেমন দোকানী মাঝে মাঝে হাত দিয়ে জল ছিটিয়ে দেয়, ওরা তেমনি জল ছিটায়, তবে অন্য ভাবে। দোকানীর পাশে থাকে একটা পেতলের বদনা। বদনার জল মুখে পুরে সেই জল কুলকুচা করে ফেলার মত ঠোঁট দিয়ে স্প্রে করে সব জল সবজিতে ছিটিয়ে দেয়। মেশিন টেশিনের দরকার নেই, চমৎকার মৌখিক ব্যবস্থা।

আমার তো গা ঘিনঘিন করতে লাগল এমনিতেই চারদিক নোংরাস্য নোংরা, তারপর থুথু জল ছিটানো। বাপরে! আমি হোটেলে ফিরে এলাম।

ফিরে তো এলাম, কিন্তু রাতের খাওয়ার পর করবটা কী? বিরাট তিনতলা হোটেল। উচু উচু সীলিং। হোটেল সাফাইওলা একটি দুটি লোক করিডরে—চেহারায় যেন ক্ষুধিত পাষাণের মেহেরালি। আমি ঘরের দরজা জানালা ভাল করে বন্ধ করে সারারাত জেগে বসে

রাইলাম। আর কিছু না স্রেফ ভয়ে। যখনই খুট করে কোথাও শব্দ হয়, চমকে উঠি। রাত যত বাড়ে মনে হয় ছাদে ধুপধাপ শব্দ, সিঁড়িতে আওয়াজ, করিডরে কার যেন ফিসফাস। আমি আরো ভয়ে সিঁটিয়ে যাই। সর্বনাশ করেছে। কী দরকার ছিল কাবুলে নামার, সোজা দিল্লি চলে গেলেই হত। আর শহরটাই বা কেমন, এত বড় হোটেল, আর বোর্ডার মাত্র একজন। কিন্তু সে একজন তো অন্য কেউ হতে পারত, আমার হওয়ার কী দরকার ছিল ?

রাত কাটল। ভোরবেলা শহরে এক চক্কর মেরে ঘুরে বের করলুম ছোট্ট একটা হোটেল। কাবুল হোটেলে ফিরে এসে টাকাকড়ি মিটিয়ে দিয়ে সোজা চলে এলুম সেই ছোট্ট হোটেলে। এখানে অনেক লোকজন। আঃ, বাচা গেল।

## টলিউডের রাজকুমার

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের চৌদ্দ নম্বর বাড়ীটাতে ঢুকতে গিয়ে কিছুটা ভয় ভয় করছিল। বাড়িখানা পেল্লাই। চেহারায় বিপুলা, কিন্তু গতযৌবনা। পলেস্তারা খসবো-খসবো করছে। আগাছাও আসকারা পাচ্ছে চত্বরে, ফটকে। আছে আর সব, নেই ছিরি-ছাঁদ। কেমন যেন গা ছম-ছম ভাব।

তাছাড়া বাড়ির মালিককে নিয়েও দুশ্চিন্তা ছিল। অনেকদিনের সাধ তাঁর সঙ্গে দু-চার কথা বলব, আধঘণ্টা সময় আদায় করেছি চেষ্টা-চরিত্তির করে, এখন ভাবনা, 'সাহেবের' মেজাজ শরিফ তো? নাকি 'মোলাকাত নেহি মাঙতা' বলে হাঁকিয়ে দেবেন দূর থেকে?

তবে একমেব ভরসা পূর্ব পরিচয়ের সামান্য সম্বল। এসেছিও শান্তিনিকেতনী সূত্রে, তাঁর দুজন নিকট আত্মীয়ের মারফতে। এবং বিস্ময়ের কথা, গৌরীপুরের রাজকুমার, স্টুডিয়ো ফ্লোরের 'বড়ুয়া সাহেব' আমার প্রস্তাবে গররাজি হন নি।

বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার কথা বলছি—আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যিনি ছিলেন ভারতীয় সিনেমা জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। ব্যক্তিত্বে, আভিজাত্যে অতুলনীয় কৃতি পুরুষ।

রাজার ঘরের ছেলে, আমাদের কৈশোরে রূপকথার রাজকুমারও তিনি। ঘরে ঘরে, মুখে মুখে ফিরত তাঁর নাম। সেকালের সিনেমা পাগল যুব সমাজের তিনি আদর্শ, তরুণীকুলের নিশা-স্বপ্ন। মুক্তি, দেবদাস, রজতজয়ন্তী, উত্তরায়ণ, শেষ উত্তর ইত্যাদি মোড়ফেরানো ছবি এবং তার নায়ক ও পরিচালকের কথা কে ভুলবে?

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। ড্রয়িং রুম অতিকায়, চারধারে নানা রকম মৃগয়ার স্মৃতি। ঘরে কেমন যেন দম আটকানো ভাব,

সুদৃশ্য ও মূল্যবান আসবাব দেখে ঠাহর হয় একদিন তাদেরও চেক্‌নাই ছিল। ছিল নয়ন-মনহরণের জাদু।

উর্দিপরা এক বেয়ারা এসে পাখা খুলে দিলে। নাম টুকে নিলে। আবার নির্জন দ্বীপে ফেলে আসা নাবিকের মত আমায় একলা রেখে সে উধাও।

আমি অধীর অপেক্ষায় ক্ষণ গুনছি এবং ভাবছি বছর দুই আগেকার কথা। ১৯৪৩ সাল। আমি তখন পড়ি স্কুলে। আমার মামারবাড়ি সিলেটের পাড়াগাঁ শ্রীগৌরীতে। বোধহয় ক্লাশ এইট নাইন হবে। নিগুঁফ হাফ প্যাণ্টের কাল চলছে। থাকিও দূরে, কিন্তু সমবয়সী আর পাঁচটা ছেলের মতই টালিগঞ্জের সিনেমা স্টুডিয়োগুলো মনে মায়াজাল গাঁথতে শুরু করে দিয়েছে। দাদা-মশায় দিদিমার কড়া চোখ এড়িয়ে দু-চারটে সিনেমাও দেখে ফেলেছি। তদুপরি তারকাদের নাম-ধাম, তাঁদের সব খুঁটিনাটি খবর ঠোঁটস্থ। যতটা জানি, কৌতূহল তার চেয়ে বেশী। এবং এই জগতের মধ্যমণি আমাদের কাছে প্রমথেশ বড়ুয়া। তিনি তখন খ্যাতির শিখরে।

এমন সময় হঠাৎ যেন কার কাছ থেকে বড়ুয়া সাহেবের কলকাতার ঠিকানা পেয়ে গেলুম। '১৪নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।' ঠিকানা তো নয়, যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, ভোজরাজের জাদুকাঠি। অনেক মুসাবিদা করে একদিন এক পোস্টকার্ড ছেড়ে বসলুম ওই ঠিকানায়। চিঠির বক্তব্য হাস্যকর। 'মহাশয়, আমি অমুক, বড় গরীব। বিপদে পড়েছি। সিনেমায় নামতে চাই। চাকরের পার্ট দিলেও ভি আচ্ছা। অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, 'ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনিয়ে বিনিয়ে সাতকাণ্ড রামায়ণ।

দিন যায়, হপ্তা যায়, চিঠির জবাব আসে না। শেষমেষ আশা ছেড়েই দিলুম। কিন্তু একদিন ডাকঘরে গিয়ে হাতে পেয়ে গেলুম সাত রাজার ধন এক মাণিক। প্রমথেশ বড়ুয়ার জবাব এসে গেছে। এবং, কী অদ্ভুত, কী আশ্চর্য, একেবারে তাঁর নিজের হাতে লেখা চিঠি। আমি আনন্দে প্রায় লাফ দিয়ে ফেলেছিলুম আর কি!

চিঠির বক্তব্য নেতিবাচক। তা হোক, আমি তো আর সত্যি সত্যি সিনেমায় নামতে চাই নি। আমার উদ্দেশ্য ছিল সিনেমায় পার্ট করে যিনি নাম কিনেছেন, তার একখানি হাতে লেখা চিঠি পাওয়া এবং তারই জোরে সহপাঠীদের তাক লাগিয়ে দেওয়া। সে আমি পেয়ে গেছি। আমাকে আর পায় কে।

চিঠিখানার ভাষা কিন্তু বড় মনোরম। পড়ে মন জুড়িয়ে গেল। তিনি লিখেছেন—

প্রীতিভাজনেষু, আপনার চিঠির প্রাপ্তি-সংবাদ জানাচ্ছি। আমার নতুন ছবির জন্য লোক অনেকদিন আগেই নিয়েছি, এখন আর লোকের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া আপনি এখন ছেলেমানুষ, আমার মনে হয় চেষ্টা করে পড়াশুনা কনটিনিউ করাই ভাল। আপনি যে ধরনের কাজ চেয়েছেন, সেই রকম কাজ করবার লোক নতুন বইতে নেই। যদি ভবিষ্যতে দরকার হয় খবর দেবো। ইতি—শুভাকাঙ্খী

প্রমথেশ বড়ুয়া
কলিকাতা, ১৮ই জুলাই' ৪৩

যতদূর মনে পড়ে, প্রমথেশ বড়ুয়া সে সময় 'মায়ের প্রাণ' বই শেষ করে 'চাঁদের কলঙ্ক' নামে আর একটি ছবিতে হাত দিয়েছেন। চিঠিতে যে নতুন বইয়ের কথা লেখা, সেটা সম্ভবত ওই 'চাঁদের কলঙ্ক'ই।

তা যাই হোক, ইতিমধ্যে ইস্কুলে, গাঁয়ে আমার কদর বেড়ে গেছে। চিঠি আমার পকেটে পকেটে ঘোরে, সুযোগ না পেলে যেনতেন পাঁচকথা পেড়ে পকেটে হাত দিই এবং অমূল্য চিঠিখানা বের করে ফেলি। যে-পড়ে, সে-ই অবাক হয়।—'প্রমথেশ বড়ুয়ার নিজের হাতের লেখা, এ্যাঃ!' সহপাঠী বন্ধুরা তো টানাটানি করে চিঠিখানা ছিঁড়েই ফেলে আর কি!

কিছুদিন পর ম্যাট্রিক পাশ করে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হলুম। সেখানে প্রমথেশ বড়ুয়ার কয়েকজন আত্মীয়ও পড়তেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এবং অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে একদিন কলকাতায় ১৪নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে চলে এলুম।

বড়ুয়া সাহেব তখন ফিল্ম লাইন থেকে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে এনেছেন। বোধহয় তখন হিন্দি ছবি 'আমীরি' তোলা হয়ে গেছে। বাইরে বিশেষ বেরোন না, আপন মনেই আত্মগোপন করে থাকেন।

আমার ভাবনার মাঝখানে ছেদ পড়ল। গৃহকর্তা স্বয়ং হাজির। পায়ে চটি, গায়ে ঢাউস ড্রেসিং গাউন, হাতে বই। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ।

উঠে দাঁড়াতেই ম্লান হেসে বললেন, 'বসুন, আই মীন বসো।'

পাশের সোফায় তিনিও বসলেন। খানিক বিরতি। তারপর খানিকটা উদাস সুরে বললেন, 'কী করা হয় ?'

'ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, শান্তিনিকেতনের কলেজে' জবাব দিলুম।

'ও, তাই নাকি' নিস্পৃহ উত্তর।

আবার চুপচাপ। আবার সূচীপতন নৈঃশব্দ্য। ইতিমধ্যে বেয়ারা রেকাবীতে দুটি রসগোল্লা, এক গ্লাস জল এবং দু কাপ চা দিয়ে গেছে।

এবারে আমার প্রশ্নের পালা। 'আপনি আর ছবি তোলেন না কেন ?

'ভাল লাগে না। মুড পাই না।'

'কোন বিশেষ ছবি তোলার সাধ ছিল ?'

'বিশেষ ছবি !' তিনি হাসলেন, 'বিশেষ ছবি বলতে কী বোঝাতে চাইছ জানিনে, তবে বিশেষ না হলে আমি কোনদিন কোন ছবিতেই হাত দিই নি।'

'আমি অনেক সময় মনে মনে ভেবেছি' সসঙ্কোচে বলি, আপনি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ছবি করছেন এবং নিজে পার্ট নিয়েছেন অমিত রায়ের।'

আমার কথা শুনে প্রমথেশ বড়ুয়া হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসির রেশ মুখে রেখেই বললেন, 'অমিত রায়ের ভূমিকা নিলে বুঝি আমাকে মানাত ?

'বোধহয়' আমার উত্তর।

'না 'শেষের কবিতা' নয়', বড়ুয়া সাহেব ধীরে গলা চড়িয়ে বলে চললেন, 'ভেবেছিলুম 'ঘরে বাইরে' পর্দায় নামাব। অনেকদিনের সাধ ছিল আমার। কিন্তু পারলুম না। বোধহয় আর পারবও না।'

গলায় নৈরাশ্যের সুর। হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে একটু থেমে বললেন, 'তুমি তো শন্তিনিকেতনের ছাত্র। গান জান, রবীন্দ্র সঙ্গীত ?'

বললুম, 'ভালবাসি, কিন্তু আমি যে অ-সুর। সুর বুকে ঠিকই আছে কিন্তু গলায় এসে আটকে যায়।'

'আমিও ভালবাসি এবং জানো না বোধহয়,' তিনি বলেন, 'আমিই প্রথম সিনেমাতে রবীন্দ্র সঙ্গীত চালাই। 'মুক্তি'তে। অনেকে আপত্তি করেছিলেন, শুনি নি। লোকেও নিয়েছে।'

তারপর চলল কথার পিঠে কথা। রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে সায়গল। সায়গল থেকে নিউ থিয়েটার্সের সেই আদিযুগের কথা। বীরেন সরকারের কথা। অনেক কিছু।

আবার স্তব্ধতা। তখন একফাঁকে সেই চিঠিখানা বের করে বললুম, 'চিনতে পারেন ?'

প্রমথেশ বড়ুয়া পড়লেন। পড়ে বললেন, 'কাকে লেখা ? তোমাকে ? ও তাই নাকি। আমি ভুলেই গেছি। তা সিনেমায় নামতে চেয়েছিলে কেন ?'

'নামতে মোটেই চাই নি', আমার জবাব, 'আসলে আপনার হাতে লেখা চিঠি পাওয়ার দিকেই ছিল লোভ। আপনি রাজী হলেও আমি নারাজ হতুম।'

প্রমথেশ বড়ুয়া মৃদু হাসলেন। আমি ঘড়ির দিকে তাকালুম। আধঘণ্টার জায়গায় প্রায় একঘণ্টা কাবার। তাছাড়া বলার মত কোন কথা নেই। গৃহকর্তাও যেন কথা বলার মুডে নেই। এবার বিদায় নিতে হয়। বললুম, 'চলি।'

তিনি কোন কথা বললেন না, মুখে সেই বিষণ্ণ হাসি।

নমস্কার করতেই তিনিও কর যুক্ত করলেন। আমি কয়েক পা সরে সিঁড়ি ধরলুম। তিনি বইয়ের পাতায় ডুব দিলেন। আমি ততক্ষণে ফের সেই ফটকের দোরগোড়ায়।

পেছন ফিরে তাকালুম। মনে হ'ল, বাড়িটার সঙ্গে বাড়ির মালিকের কোথায় যেন মিল আছে। দুজনেই জীর্ণ, দুজনেই ক্লান্ত। অবসন্ন। শির এখনও সমুন্নত, কিন্তু সূর্য হেলেছে পশ্চিমে।

বাড়ির মালিকের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। তারপর ১৪ নম্বরের বাড়িতে গিয়েছি অনেকবার। পলেস্তারা আরও পড়েছে, আগাছা আরও বেড়েছে। বাড়ির মালিকও বিগত। বেঁচে আছেন শুধু নামে। বছরের পর বছর যায়; সেই অদ্বিতীয় নামেও পলেস্তারা পড়ছে।

## জাদুর জগৎ ডিজ্‌নিল্যাণ্ড

সবাই বলে ডিজনিল্যাণ্ড, ডিজনি নিজে বলেন জাদুর জগৎ—'দি ম্যাজিক কিংডম।' জাদুই বটে, দু'শো বিঘে জমি জুড়ে ভোজবাজি, ভানুমতীর খেলা। কল্পনা সেখানে হার মানে, রূপকথা জ্যান্ত হয়, এবং অবাক হতে হতে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না।

এই জাদুকরের নাম ওয়ালটার এলিয়াস ডিজনি, সংক্ষেপে ওয়াল্ট ডিজনি—স্কুলের গণ্ডি পার না হয়েও যিনি হারভার্ড, ইয়েলের ডকটরেট, হাজার হাজার খেতাব-খেলাতের মালিক। মাঝারি লম্বা গড়ন, অস্থির দীর্ঘ হাত এবং অসাধারণ দুটি চোখ। জন্ম শিকাগোয়, বাল্যে কাজ করেছেন মিজোরার খামারে, নকল করতেন পশুপাখির গলা। হঠাৎ একদিন খুলে বসলেন স্টুডিও—ক্যালিফরনিয়ার বুরব্যাঙ্কে। শুরু হল কারটুন ছবি, জন্ম নিল মিকি মাউস। গোড়ায় নাম দিয়েছিলেন মর্টিমার। একদা স্টুডিওকর্মী, পরে স্ত্রী লিলিয়ান বললেন—না, নাম দাও মিকি মাউস। সেই নামই আনল জগৎজোড়া খ্যাতি। এল ডোনাল্ড ডাক, তৈরি হতে থাকল হাজার হাজার কারটুন, সিনেমা, ন্যাচার ফিল্ম, গানের রেকর্ড, বই ছাপা, কমিক স্ট্রিপস, টি-ভি পিকচার্স। আয়ের অঙ্ক বাড়তে বাড়তে দাঁড়াল বছরে পঁয়ষট্টি কোটি টাকা।

নিজে কোন ছবি আঁকেন না, কিন্তু সব কিছুতেই থাকে 'ডিজনি-টাচ।' স্টুডিওতে থাকেন সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাত আটটা। ছুটি নেননি কোনদিন। ভাই রয় ম্যানেজার, স্ত্রী গল্প বাছাই করেন। আর আছে কয়েক হাজার শিল্পী। সব দিকেই তাঁর নজর, সব শিল্পীই জানতে চায়—'হাউ ডাজ ওয়াল্ট লাইক ইট?'

ডিজনিল্যাণ্ড গড়ার স্বপ্ন ১৯৩০ সাল থেকে। দুই মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক এমিউজমেণ্ট পার্কে, ফিরে এলেন বিরক্ত হয়ে।

বললেন, ওগুলো পার্কই না—'ডার্টি ফোনী প্লেসেস, রান বাই টাফ-লুকিং পিপ্‌ল।' লস এনজেলেস থেকে মাইল তিরিশেক দূরে আনা-হাইমে অবশেষে ১৯৫৫ সালের ১৮ জুলাই তাঁর স্বপ্ন রূপ নিল। পত্তন হল ডিজনিল্যাণ্ডের। সব মিলিয়ে মোট ১৭০ একর জায়গা। গোড়াতেই খরচ সতের মিলিয়ন ডলার, সেকেলে হিসেবে প্রায় তের কোটি টাকা। তাছাড়া এযাবৎ মোট ঢালা হয়েছে আরও চল্লিশ কোটি টাকা। বছরে লোক দেখতে আসে ৬০ লাখ। সকাল সন্ধে সেখানে কাজ করছেন সাড়ে চার হাজার কর্মী। নিজের মেয়ের মত ভালবাসতেন ডিজনি এই জায়গাটিকে। ওইখানেই তাঁর থাকার ঘর। ওইখানেই তাঁর সব। ১৯৬০ সালে, বড়দিনের আগে গিয়েছিলাম সেই 'জাতুর জগৎ' দেখতে। সানটা মনিকা থেকে আমার বন্ধু ডীন ফ্রাংক আর তার তিন ছেলের সঙ্গে। আমরা সবাই খোদ ডিজনির অতিথি, তাই অবারিত দ্বার। এবং সকাল ন'টায় দরজা পেরোতেই চিচিং ফাঁক।

মনে মনে নয়, দেখে দেখে রূপকথার রাজ্যে হারিয়ে যাবার মানা এখানে নেই, সটান গিয়ে হাজির নয়া কলোনি পুরনো আমেরিকায়। আদ্যিকালের রাস্তাঘাট, দোকান পাট, পসরা, পোশাক। খানিক আগে ছেড়েছি চোখ ধাঁধানো লস এনজেলেস, এ জগৎ একদম আলাদা। ঘোড়ার গাড়ির ঠুংঠাং, ধরণ ধারণ জবড়জং।

খানিক এগোতেই চক্ষুস্থির, এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায়। এই প্রথম টের পেলাম তু' চোখই যথেষ্ট নয়, ডিজনিল্যাণ্ডে হওয়া চাই সহস্রলোচন। আকাশে উড়ছে হাতি, জলে নামছে সাবমেরিন, চক্কর মারছে মনোরেল, বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী তার কোলে দাঁড়িয়ে আছে স্পীড বোট। বোট ছুটতেই পলকে পলকে পালা-বদল। আমরা কখনও তাইল্যাণ্ডের ভিতরে, কখনও কঙ্গোর গভীর অরণ্যে। বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে পাগলা হাতি। বোটের ঠিক সামনে, কী সর্বনাশ! মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে হিপোপটেমাস। ফ্রাংকের সাত বছরের ছেলে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে ভয়ে। গেল

গেল, নৌকো বুঝি ডুবল। না, কোনক্রমে সে যাত্রা প্রাণ বাঁচল। নদীর পাড়ে ছুটে এসেছেন সেই মুহূর্তে এক শিকারী। অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য, হিপো গুলিবিদ্ধ, হাতি পলাতক।

খানিক বাদে "হুই-হাই" চিৎকার, আমরা আফ্রিকায়। সেখানে ধুনি জ্বালিয়ে গোল হয়ে নাচছে নিগরোর দল। এমন সময় ঠিক আমাদের বোটের কোল ঘেঁসে বনবাদাড় কাঁপিয়ে একরোখা এক গণ্ডার তীর বেগে তাড়া করল নাচিয়েদের। ভয়ে আমরা কাঠ, ওরা ছুটল এক গাছের দিকে। সড় সড় গাছে উঠে পড়ল একের পর এক, গণ্ডার ততক্ষণে পগার-পার।

আধ ঘণ্টার সফর, আঠারশ সেকেনডের রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা। বোট থেকে নামতে নামতে ডীনকে বললাম, কী করে এই অসম্ভব সম্ভব। ডীন বলল—সব নকল, সব যন্ত্রে চলে।

অতঃপর সাবমেরিন যাত্রা। জলে ডুব দিলাম সবার সঙ্গে। নামল বোধ হয় তিনি কি চার ফুট, মনে হল কয়েক হাজার ফুট নিচে নেমে গিয়েছি। আর সেখানে অতল সাগরের অতল রহস্য চারধারে ছড়ানো। কাচের বড় বড় জানালা দিয়ে সব দেখছি। অকটোপাস আসছে, তিমি ঝাপটা মারছে, রত্নদ্বীপে জ্বল জ্বল করছে মণিমুক্তা, নাম-না-জানা কত রকমের সামুদ্রিক জীব। দশ মিনিট মাত্র সময়, কিন্তু উপরের ডাঙায় যখন আবার পা দিলাম, মনে হল দশ কোটি যোজন পার হয়ে এসেছি।

আবার মেইন স্ট্রীটে, ১৯০০ সালের আমেরিকায়। এপাশে আইস-ক্রীম পারলার এবং ওপাশে তারই লাগোয়া সানতা ফে অ্যাণ্ড ডিজিনিল্যাণ্ড রেলরোড। রেল চড়ে পার হয়ে এলাম গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন, রেড ইনডিয়ানদের আস্তানা, প্রকৃতির নানা বিস্ময়—কত রকমের জীবজন্তু, পাখি, গাছপালা। ঘুরে বেড়াচ্ছে জন্তু জানোয়ার। এবং মাথা তুলে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ঘুম-পরীর বাড়ি—স্লিপিং বিউটি কাস্ল।

ফাংক বললে, একদিনে সব দেখা অসম্ভব, বাছাই করতে হবে।

গোড়ায় চস্ এডভেনচার ল্যাণ্ডে। তারপর পুরোনো কলামবিয়া জাহাজ চড়ে টম সায়ার্স আইল্যাণ্ডে, ঘুম পরীর দেশে, মনোরেলে। সেখান থেকে ফ্রনটিয়ার ল্যাণ্ড, টুমরোল্যাণ্ড, ফ্যানটাসি ল্যাণ্ড। এবং টিকি রুম।

গাইড দেখিয়ে দিল বাঁদিকের রাস্তা। হঠাৎ পেলাম বুনোগন্ধ। ঝোপঝাড়, বন বাদাড়ে সত্যিকারের এডভেনচারের জায়গা। জঙ্গলের মাঝ ফ্যানটাসিল্যাণ্ডে অন্য জগৎ। ছেলেবেলায় শোনা নানা রকমের রূপকথা সেখানে বাস্তব হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওইতো তুষারকন্যা স্নো হোআইট, ঘনবনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল। সে-ই আমাকে নিয়ে গেল সাত বামনের কাছে। তারপর কোথায় গেল সেই তুষারকন্যা আর কোথায় গেল সেই সাত বামন, আমি তখন ক্যাপটেন হুকের হাত থেকে পালানো পিটার প্যানের সঙ্গে ছুটছি। পিটার প্যান উধাও, এবার আমি কখনো এলিসের সঙ্গে আজব দেশে, কখনও সিনডেরেলার স্বপ্নাবাসে, কখনও বা পিনোকফিওর গাঁয়ে।

দেখতে দেখতে বেলা দুপুর। দোকান থেকে খাবার কিনে খেয়ে আবার এক রূপকথার জগতে—ফ্রনটিয়ার ল্যাণ্ডে। সেখানে রয়েছে শ' দুয়েক নকল পশু-পাখি—ঘুরছে ফিরছে, লড়ছে—পৃথিবীর সেই আদিম যৌবনের সকল তাড়না নিয়ে। ধীরে ধীরে সভ্যতার বিকাশ, অতীত আমেরিকার নদী-নালা বেয়ে বেয়ে মার্ক টোয়াইনের দেশে, রেড ইনডিয়ানদের পাড়ায় এবং আবার টম স্যয়ারের দ্বীপে।

টুমরোল্যাণ্ডে ভবিষ্যতের ছবি। কিন্তু ততক্ষণে আমি আমাতে নেই। কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেছি। বিংশ শতাব্দীতে আছি, না ত্রিংশ শতাব্দীতে ঘুরছি? নাকি বিশ খৃস্টপূর্বাব্দে ফিরে গেছি। ডীন ফাংককে বললাম, ভাই, বাড়ি চল। আর কিছুক্ষণ থাকলে, আমি এখানেই থেকে যাব।

## হাফলং পাহাড়ে

হাফলং শহরের সেই ভয়ংকর রাতের কথা এখনও মনে পড়ে। বিদ্রোহী নাগা বাহিনীর আক্রমণের আশংকায় আমাদের কারও চোখে সেদিন ঘুম ছিল না।

১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে সেখানে গিয়েছি। মহকুমা হাকিম মিস্টার অনিল চৌধুরী চুপিচুপি বলে গেলেন, 'সাবধানে থাকবেন, আজ রাত্রে একটা কিছু হতে পারে।'

ছিলুম ডাকবাংলোয়। নির্জন শৈলশহরের এই নির্জনতম প্রান্তে আমার আস্তানার পেছনেই দুটি বিবর ঘাঁটি। কোটরাগত দুই চোখ উঁচিয়ে তাকিয়ে। চার পাশে পুলিশের কঠিন পাহারা, সব নিঝুম। পাইন পাতার শিরশিরানি ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। মাঝে মাঝে শুধু দমকা হাওয়ার ফলা সড়াক সড়াক ডাকবাংলোর গায়ে খোঁচা মারে।

সেদিন সকালেই খবর এসেছে, হাফলং শহর থেকে মাইল দুই দূর দৈয়ং রেল পুলের কাছে নাগাদের দেখা গেছে, পাহাড়ী নদী পেরিয়ে তারা নাকি এদিকেই আসছে। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক, চোখে হিংসার আগুন।

একটা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্যে আমরা তাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি। কারণ সুচতুর সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াও সহজ নয়। পাহাড়ের কোলে এরা হরিণের মত চলে। জলপাই-সবুজ পোশাক গাছের এবং ঘাসের রঙে মিশে যায়। অব্যর্থ এদের লক্ষ্য। অক্লেশে এরা বিপদের ঝুঁকি নেয়।

সন্ধ্যার পর থেকে গোটা শহর খালি। দরজা জানালা সব বন্ধ। বাইরে উঁচুনিচু পথের ওপর শুধু প্রহরীর সদর্প বুটের আওয়াজ কিংবা হঠাৎ কোন পথচারীকে দেখে বুকের-রক্ত-জল-করা একটি মাত্র চিৎকার—'হল্ট।'

ভয় আমাদেরও মনে। ১৯৫৮ সাল। নাগা বিদ্রোহীদের খবর জোগাড় করতে সাংবাদিক হয়ে এসেছি। শিলচর থেকে যখন হাফলং আসি, সেদিন দামছড়া রেল স্টেশনের কাছে আমাদের ট্রেন আচমকা থেমে যায়। থামতেই গুলির শব্দ। আর ধোঁয়া।

কী ব্যাপার। ট্রেন থেকে নেমেই শুনি, এইমাত্র নাগাদের সঙ্গে আমাদের পুলিশের এক জবর লড়াই হয়ে গেছে। দামছড়া স্টেশনের পেছনের জঙ্গল দিয়ে একদল নাগা পাকিস্তান পালাচ্ছিল। টিলার ওপরের পুলিশফাঁড়ি তা' দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোঁড়ে। ব্যস, ওই তরফ থেকেও পালটা গুলি।

ছোটখাট এই খণ্ডযুদ্ধে কেউ হতাহত হয়নি বটে, কিন্তু ষোল জনের একটি নাগা দল তখনই ফাঁকি দিয়ে সিলেট পালিয়ে যায়। খুব সম্ভব সেই দলে ফিজোও ছিলেন।

কোনক্রমে এলুম হাফলং। সেখানের নাগা দমনের ঘাঁটি করা হয়েছে। বড়াইল পাহাড়ের কোলে ছোট শহর। আঁকাবাকা রাস্তার চারধারে পাইন কৃষ্ণচূড়া, আর গুলমোরের ভিড়। টিলার ফাঁকে ফাঁকে বাংলো বাড়ি। এক পাশে বিরাট লেক। এবং পাহাড়ের সানুদেশেই অসংখ্য নাগা বস্তি।

হাফলংে নামার পরদিনই এল দুঃসংবাদ। বুক-ঢিপ-ঢিপ-রাত্রে শুয়ে মনে পড়ল অশোকবিজয় রাহার সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন—

আমি তো দেখেছি ধূম্রদেহ
হাফলং হিল,—
অতিকায় দনুর সন্তান।
কোমরে জঙ্গল গোঁজা,
সূর্য্যের মাকড়ি জ্বলে কানে।
দূর শূন্যে বল্লম উঁচানো।"

এই 'দনুর সন্তানের' সঙ্গে আমি বিদ্রোহী নাগাদের চেহারার বেশ মিল খুঁজে পেলুম।

সে যাই হোক ভয়ে ভয়ে কালরাত্রি কাটল অনিদ্রায়। ভোরবেলা বিছানা ছাড়তেই মনে হল খুব বেঁচে গেছি। কিন্তু খানিক যেতে না যেতেই আর একটি দুঃসংবাদ। মহকুমা হাকিমের কাছে যেতেই জানালেন, একদল নাগা মাইবং লুট করে পালিয়েছে কাল রাত্রে। একজন রেলওয়ে ট্রলিম্যানও নিহত রাত ১০টায়।

বোঝা গেল, নাগারা হাফলং না এসে মাইবং-এর দিকে গিয়েছে। সাজ সাজ রবে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বেরিয়ে পড়ল ডি-আই-জি লালা বিমলেন্দুকুমার দে'র নেতৃত্বে। আমিও সেই দলের সঙ্গী।

ঘটনাটি ঘটে হাফলং থেকে খানিক দূরে হিল সেক্সনের মাইবং রেল স্টেশনে এবং মাইবং বাজারে। সেখান থেকে ৭।৮ মাইল দূর গুইলং গ্রাম সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডা। এখানেই ছিল নাগানেত্রী রানী গুইদালোর বাড়ি। দিন কয় আগে একদল নাগা কোহিমা থেকে পার্বত্য পথে এসে গুইলঙে ঘাঁটি গাড়ে। তারপর একদিন হাজির মাইবং।

স্টেশনের অদূরে ছিল এক ট্রলি। ট্রলিম্যানের মাথায় লাল পাগড়ি। নাগা কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন নিপোৎসে ভাবলে—পুলিশ। দমাদম গুলি চালিয়ে খতম করলে ওই ট্রলিম্যানকে। এবং একজন এসিস্ট্যান্ট ওয়ে ইন্সপেক্টারও সেখানে গুলির ঘায়ে জখম।

ঝড়ের বেগে ছুটে নাগারা হানা দিল রেলস্টেশনের বুকিং অফিস। টেলিফোনের লাইন কেটে ক্যাশ বাক্সটি বগলদাবা করে ঢুকে পড়ল কাছের বাজারে। সেখানে সমাজ কল্যাণ অফিসের রেডিওটি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট।

পরদিন আমরা যখন মাইবং এলুম চারদিকে সন্ত্রাসের হাওয়া। সকলের মনে ভয়, আবার বুঝি নাগারা আসে। রাইফেল হাতে পুলিশ এসেই ধাওয়া করল ওই পলাতক নাগাদলের পেছনে। খবর পাওয়া গেল ওরা গেছে লাইসঙের পথে। আমরাও সেই পথে ছুটলুম।

খবরটা ঠিক। দু'দলে দেখা হয়ে গেল ছোট লাইসংের কাছে। একটা বিরাট খাদের সামনে দু'পক্ষের মুখোমুখি সাক্ষাৎ। আমি সবার পেছনে। একটা জীপ গাড়ির ভেতরে গুটিসুটি বসে আছি। সঙ্গের পুলিশ অফিসার বললেন—'ভয় নেই, তবে সাবধানে থাকবেন।'

হঠাৎ শুনলুম বিরাট এক চিৎকার—'হল্ট!' তারপরেই গুড়ুম, গুড়ুম, গুম।

অকন কাকতি নামে এক পুলিশ ওই চিৎকার দিতেই নাগারা তার উত্তর দেয় বুলেটে। খানিক বাদেই খবর পেলুম, অকন কাকতির প্রাণহীন দেহ অরণ্যে লুটিয়ে পড়েছে।

ওদিকে তখন চলছে প্রচণ্ড লড়াই। রাইফেলের আকাশ ফাটানো আওয়াজে ছোট লাইসংের জঙ্গল বারবার কেঁপে উঠছে। নাগারা সংখ্যায় ২২।২৩ জন, পুলিশ জন পঞ্চাশ।

লড়াইয়ের শ'দুয়েক ফুট দূরে বসে আমি তখন ভাবছি, না এলেই হত। কে জানে হয়ত বেঘোরেই আজ প্রাণটা দেব। যদি পুলিশ নাগাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারে, তাহলে নির্ঘাৎ অপমৃত্যু। অথচ আর ফেরার উপায় নেই। কী আর করি, দুই কানে আঙুল দিয়ে এবং চোখ বুঁজে ঠায় বসে আছি।

এইভাবে ঘণ্টাখানেক চলল। ধস্তাধস্তিতে দু'দলের অনেকে খাদের নিচে গড়িয়ে পড়েছে। পুলিশের অনেকে আহত, ওপক্ষে মারা গিয়েছে তিনজন। তার মধ্যে আছে কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন নিপোৎসে। নিপোৎসের মৃত্যুতেই নাগারা রণে ভঙ্গ দেয়।

আমার জিপের কাছে টেনে নিয়ে আসা হল পুলিশ বাহিনীর ভূধর গোঁহাইকে। গুলির আঘাতে তিনি অজ্ঞান। অন্ধকারের বুক চিরে তাঁর তাজা রক্ত অবিরাম বয়ে চলেছে।

খানিক বাদে এলেন একজন পুলিশ অফিসার। বললেন—'ব্যাটাদের তাড়িয়েছি। কয়েকজন ধরাও পড়েছে। চলুন এবার ফেরা যাক।'

শেষ রাতের আবছা অন্ধকারেই দেখতে পেলুম, ওই অফিসারের হাতে, জামায় রক্তের দাগ। হাত বুলোতে গিয়ে দেখি আমার কপালেও ঘামের বড় বড় ফোঁটা।

জিপ আবার ছুটল হাফলংের দিকে। সূর্য্যের আলো তখন ফুটি-ফুটি।

হাফলং ফিরে দেখা ভিজেটোর আঙ্গামির সঙ্গে। ভিজেটো দু'দিন পর ধরা পড়েছে। সে ওই লড়াইয়েরই ফসল। ভিজেটোর বয়স আন্দাজ তিরিশ। পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারা। পরনে জলপাই সবুজ হাফশার্ট, ফুল প্যাণ্ট, পুরো জঙ্গী পোশাক। হাসপাতালের বারান্দায় সে শুয়েছিল এক চারপাইয়ের ওপর।

তার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো। তারই যন্ত্রণায় সে বেদনার্ত। যন্ত্রণার ছাপে কঠোর মুখ কঠোরতর।

নাগা ব্যাটালিয়ানের কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন নিপোৎসে'র অধীনে লড়াই করছিল ভিজেটো। হঠাৎ তার পা পিছলে যায়। তারপর তার কিছু মনে নেই। ভিজেটো আঙ্গামির অচেতন দেহ লুকিয়ে থাকে গভীর খাদের অতলে।

এদিকে লড়াই শেষ। নাগা ব্যাটালিয়ান পালিয়েছে পুলিশের তাড়ায়। মারা গেছে ক্যাপ্টেন নিপোৎসে। লড়াইয়ের ঠিক দু'দিন পর পুলিশ বেরোয় তল্লাসে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, কী আশ্চর্য, এক নাগা সিপাই খাদের ভেতরে। প্রাণ আছে, সংজ্ঞা নেই।

তাকে ধরাধরি করে আনা হল লাইসং। দেখা গেল, মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে ফ্রাকচার। তদুপরি দু'দিন দু'রাতের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সে বিবর্ণ।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু জ্ঞান ফিরে এল। কথাবার্তায় পাক্কা বাদশাহী মেজাজ। প্রথম কথা—"শরাব লে আও।" মদ দিতে একজন আপত্তি করতেই সে তেতে ওঠে বলে—"কেয়া, ইতনা বড়া মিলিটারি ক্যাম্প, শরাব নহি মিলতা?"

ভিজেটো ধূমপান করতে চাইল। একজন সিগারেট এগিয়ে দিতেই সে বলে—"নেহি, নেহি সিগারেট নেই মাংতা, মিকশ্চার লাও।"

উত্তর কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার মিস্টার সি এস বুথ এবং আসাম পুলিশের ডি-আই-জি লালা বিমলেন্দুকুমার দে তাকে নিয়ে এলেন হাফলং। তার সঙ্গে এল ওদের দলের তিনটে রাইফেল, একগাদা গুলিগোলা আর একটি নাগা ছেলে। তার নাম কাম্বে জেমি—ছোট লাইসংয়েরই লোক। বিদ্রোহী দলকে সাহায্য করার এবং একটি বন্দুক আনার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাচ্চা ছেলে। রঙীন পোশাকে সুন্দর চেহারা।

হাফলং হাসপাতালে গিয়ে দেখি সিভিল সার্জন ডাক্তার রসময় সিংহ ভিজেটোকে পরীক্ষা করছেন। একটু চাঙা হলেই শুরু হবে পুলিশী জেরা। তাতে হয়ত বেরিয়ে পড়বে নাগা কাহিনীর অনেক গুপ্ত কথা।

ভিজেটো কিন্তু তাদের ঘাঁটির খবর জানাতে ইতিমধ্যেই নারাজ হয়ে গেছে। তাঁর মোদ্দা কথা—অস্ত্রশস্ত্র, নগদ টাকা এবং প্রচারের জন্যে তারা গোলমাল চালিয়ে যাবে। জানুক পৃথিবীর সবাই; নাগা সমস্যার সমাধান হয়নি।

এক রোখা গোঁয়ার ভিজেটোকে বললুম "খিদে পেয়েছে?" সে সম্মতির তালে মাথা নাড়াল।

আবার বললুম—"কেন এই গোলমাল চালাচ্ছ? কী কষ্ট দেখো তো?"

ভিজেটো চুপ। আমার ফের প্রশ্ন—"তোমাদের নাটের গুরু ফিজো কোথায়?"

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে ভিজেটো পালটা প্রশ্ন করলে—কমাণ্ডার সাব্, কঁহা গিয়া?"

"—কোন কম্যাণ্ডার? ক্যাপ্টেন নিপোৎসে?"

—"হাঁ। হাঁ।"

"—আরে উয়োতো মর গয়া।"

—"মর গয়া?"—অতিকষ্টে এই কথাটি উচ্চারণ করে কম্বলের তলায় মুখ লুকালো ভিজেটো। দেখলুম, তার চোখে বেদনার ছায়া।

ভাতের থালা এগিয়ে ভিজেটোকে সরানো হল লক আপ ঘরে।
হঠাৎ একটা গোঙানি শুনে তাকিয়ে দেখি হাসপাতালের ভেতরেই শুয়ে আছেন ছোট লাইসং লড়াইয়ের বীরযোদ্ধা হাবিলদার চন্দ্র-কিশোরদেব। সমস্ত শরীরে আঘাতের অসংখ্য চিহ্ন। দুই পক্ষের দুই যোদ্ধা একবার মিলে ছিল ছোট লাইসংএর জঙ্গলে, আবার তাদের দেখা হল হাফলংএর হাসপাতালে।

হাবিলদারটি বাঙালী। বাড়ি সিলেটের ছাতিয়াইন গ্রামে। দীর্ঘকায় জোয়ান চেহারা। তাঁর বীরত্বের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। ক্যাপ্টেন নিপোৎসে ঘায়েল হয়েছে তাঁরই হাতে। প্রথমে গুলি বিনিময়, তারপর হাতে হাতে লড়াই। জানুদেশে গুলির আঘাতে ক্ষিপ্ত নিপোৎসে ঝাঁপিয়ে পরে হাবিলদারের বুকে। দুজনে তখুনি গড়াগড়ি দিল 'মরণ-আলিঙ্গনে।' কে হারে কে জেতে ঠিক নেই। দেড়শ ফুট খাদের কিনারে, অন্ধকার জঙ্গলের নীরবতা খান খান করে "কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে।"

তারপর হাবিলদারের হুঁশ নেই। চোখ খুলল এই হাসপাতালে এসে। এবং শত্রু নিপোৎসে তখন নিপাত হয়ে পৃথিবীর বাইরে,।

## খবরের পিছনে খবর

এই সেদিন টেলিপ্রিণ্টারে আসা খবরের তাড়া হাতড়াতে হাতড়াতে একটি নাম দেখে চমকে উঠলাম। মাওয়ি নাগা। পিকিং থেকে নাগাভূমিতে ফেরার পথে এই কীর্তিমান বৈরী নাগা নেতাকে পাকড়াও করা হয়েছে, নিয়ে আসা হয়েছে লাল কেল্লায়। সেখানে তার বিচার হবে। বিরাট বড় খবর। পরদিন সব কাগজেই তা ছাপা হল ফলাও করে।

মাওয়ি নাগা। চেনা নাম। মনে পড়ে গেল বারো বছর আগেকার একটি ঘটনা। রিপোর্টার হয়ে তখন ঢুকেছি। খবর তাড়া করব কি, অনেক সময় খবর নিজেই তাড়া করে। সেই তাড়ার চোটে প্রায় আটক হতে চলেছিলাম পুলিশের হাতে।

১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি। ছুটিতে গিয়েছি শিলচর। সেখানে আমার সতীর্থবন্ধু আশিস দত্ত নূতন ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে। একদিন ইচ্ছে হল দেখে আসি আশিস আদালত কেমন চালাচ্ছে। গিয়ে পেয়ে গেলাম সাত রাজার ধন এক মাণিক—চমকপদ এক খবর। সেই খবর আনন্দবাজারে ছাপা হতেই হইচই, রীতিমত ইণ্টারন্যাশনাল স্কুপ। এই খবরই সর্বপ্রথম প্রমাণিত হয় নাগাদের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগসাজস।

আশিসের আদালতে বিরাট এক পুলিশ বাহিনী ধরে নিয়ে এসেছে এক নাগাকে। ওকে ঢাকা থেকে কোহিমা পালানোর পথে কাছাড় নাগা সীমান্তে দামছড়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওর কাছ থেকে আদায় করা স্বীকারোক্তির বিশদ বিবরণ। পেশ করা হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রকাশ্য আদালতে। ওটাই নিয়ম।

স্বীকারোক্তির ভিতরে তাক লাগানো খবরের উঁকিঝুঁকি দেখে আমার হাত নিসপিস করতে লাগল, তখন ভাবতে লাগলাম কী করে

খবরটা সাজিয়ে গুছিয়ে কলকাতায় পাঠানো যায়। ফিজো, নিউইয়র্ক টাইমস্, রাষ্ট্রপুঞ্জ নানা রকম শব্দের চোটে আমি একেবারে উল্লাসের তুঙ্গে। আরও মজার ব্যাপার। এই নাগাটি বেশ কিছু কাল ছিল কলকাতার ছয় নম্বর সুতারকিন স্ট্রীটে আনন্দ বাজার পত্রিকা অফিসের ঠিক লাগোয়া বাড়িতে চার নম্বরে। অবাক কাণ্ড, সংবাদপত্র অফিসের গায়ে একটা তাজা সংবাদ লুকিয়ে ছিল, আর আমরা কোন্ ছার, কলকাতার ঝানু পুলিশও জানত না।

নাগাটির নাম মাওয়ি, ফিজোর নিকট আত্মীয়, বেরী দলে প্রথম সারির নেতা। তাঁর বয়স ছাব্বিশ, লম্বায় পাঁচ ফুট ন 'ইঞ্চি। মাঝারি গড়নের চেপ্টা শরীর, চৌকো চোয়াল, ব্যাক ব্রাশ করা চুল, চোখে চশমা ঠোঁটে গালে সামান্য গোঁফ দাড়ি। কথায়-বার্তায় চাল-চলনে সব সময়েই সপ্রতিভ ভাব।

মাওয়ির বাবার নাম জাতসু আঙ্গামি বাড়ি কোহিম থানার বোনোমা গ্রামে। তিন ভাই চার বোন। কোহিমাতে প্রাথমিক পড়াশুনা করে ১৯৫৩ সালে মার্চ মাসে সে ভর্তি হয় দার্জিলিং-এ মাউন্ট জার্মান জুনিয়ার ক্যাম্ব্রিজ স্কুলে। ১৯৫৪ সালে ডিসেম্বর মাসে পড়া ছেড়ে চলে আসে কলকাতা। কেশব সেন স্ট্রীটে ওয়াই. এম. সি. এ হোস্টেলে গাঁয়ের লোক মোকু জেৎসুরি নামে এক নাগা ছাত্রের সঙ্গে থাকে। চার দিন পর দেশে ফিরে চলে আসে। বাবার সঙ্গে চাষ আবাদে মন দেয়।

কিন্তু কিছুদিন যেত না যেতেই ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি সারা নাগা জেলা জুড়ে হল নাগাদের দৌরাত্ম, মাওয়িও ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আন্দোলনে। সেই বছরই আরও কয়েকজন নাগা নেতার সঙ্গে সে এল শিলং-এ আপস আলোচনার কথাবার্তা চালাতে। ফল হল না।

ইতিমধ্যে বৈরী নাগা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। থৃশনিসা তার সভাপতি। মাওয়ি হল তার পলিটিক্যাল অফিসার। কিছুদিন ধরে কেবল গোপন সভা সমিতি চলল গভীর জঙ্গলের আড়ালে

আড়ালে। অন্যদিকে শুরু হল লড়াই। একটি গোপন সভায় ঠিক হল অস্ত্রশস্ত্র ওষুধপত্র আমদানির জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জে নাগাদের সম্পর্কে কথা বলার ব্যবস্থা করার জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার কার্যের জন্যও বাইরে লোক পাঠানো দরকার। মাওয়ির উপর পড়ল সেই ভার। সভাপতি থ্‌শনিসা তাকে বলল রাষ্ট্রপুঞ্জে নাগাদের দাবি উত্থাপন করার জন্য পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করতে। তাঁকে দেওয়া হল নগদ পাঁচ হাজার টাকা। আর দেওয়া হল স্বাধীন নাগা সরকার গঠনের ঘোষণাপত্র, নেহেরু ও পন্থকে লেখা চিঠি এবং নানা খবর পত্র।

কলকাতা হয়ে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করার বাসনায় মাওয়ি ১৯৫৬ সালে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি স্বাধীন নাগা রাজ্যের রাজধানী থেকে রওনা হয়ে সাতাশে এল ডিমাপুরে। তারপর ট্রেনে গৌহাটি এবং উনত্রিশে সন্ধ্যায় বিমানে সোজা কলকাতা। এসে উঠল সুতারকিন স্ট্রীটের চার নম্বর বাড়িতে। সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করল এক ইংরাজ ভদ্রলোকের। অনেকদিন আগে থাকতেই তাঁর সঙ্গে নাকি ঐ ভদ্রলোকের আলাপ।

কলকাতা থেকে শুরু হল মাওয়ি নাগার গোপন অভিযান। স্থানীয় কয়েকজন নাগার সঙ্গে পরামর্শ হল। প্রথমে ঠিক হল জাহাজে করে সে পালাবে ইংলণ্ডে কিংবা মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হল না। মাওয়ি মনমরা হয়ে কখনও বসে থাকে ঘরের ভিতরে, কখনও বা চৌরঙ্গীর পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, কী করা যায়।

এমন সময় হঠাৎ এক সংবাদ এল যে বাসে বা ট্রেনে বিনা ছাড়-পত্রে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবিলম্বে রওনা হওয়া দরকার। বাইশে সেপ্টেম্বর সে একটি বাসে রওনা হল বসিরহাট। সেখান থেকে নৌকায় নদী পার হয়ে অন্য একটি বাসে চেপে মাইল পাঁচ রাস্তা চলে গিয়ে পৌঁছল একটা গ্রামে। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের লোক ঠিক করা ছিল। তার সঙ্গে দেখা করে

হেঁটে ঢুকে পড়ল পূর্ব পাকিস্থানের ভিতরে। উঠল এক মুসলমান ভদ্র লোকের বাড়িতে। এই বাড়িতে অসুস্থ হয়ে থাকল তিন দিন। পাকিস্থানে এসে তার নাম হয়ে গেল চু-ওয়াং যেন জাত-চীনে।

ঐ বাড়ি থেকে বাসে চেপে মাওয়ি এল যশোর শহরে। উঠল ফিরোজ হোটেলে। তার পরদিন ঢাকা শহরের রমনার গ্রীন হোটেলে। এক রাত কাটিয়ে সে এল নবাবপুর রোডের পাকিস্থান বোর্ডিং হোটেলে। হোটেলের খাতায় চীনা মুসলমান রূপে নাম লেখালে মিঃ এ রহমান।

আগে থাকতেই সব ঠিকঠাক করা ছিল। পনেরোই অক্টোবর সে দেখা করতে গেল পূর্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআতাউর রহমান খানের সঙ্গে। গোপন বৈঠক বসল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এক নিভৃত কক্ষে। মুখ্যমন্ত্রীকে খোলাখুলি সব কথা বলল। তথাকথিত নাগা সরকারের জন্য চাইল সাহায্য—অস্ত্রশস্ত্র সব কিছু। আর বলল, রাষ্ট্রপুঞ্জে নাগাদের দাবী তোলার কথা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ শেষ করে সে বেরোল ঢাকার পথে। পথে পরিচয় হল হাসানাইল সিদ্দিকি এবং অন্য একজন পাঞ্জাবী ছোকরার সঙ্গে।

অক্টোবর মাসেই খোদোয়া ইয়ান খান লোথা নামে আর একজন নাগা এল ঢাকায়। উঠল চকবাজারে হোটেলে। সে খাসিয়া পাহাড়ে হেঁটে পার হয়ে সিলেটের ভিতর দিয়ে এসেছে পাকিস্থানে। ইতিমধ্যে করাচীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে ফিরে এসেছে ঢাকায়। দু'জনে মিলে শলা-পরামর্শ চলল। একটি চিঠি গেল 'ফিজোর নিকট। আর একটি গেল আমেরিকার নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকের কাছে। ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় এল আর তিনজন নাগা যুবক। একজন সিলেট হয়ে। আর একজন চট্টগ্রাম হয়ে। অন্য জন লুসাই পাহাড় ডিঙিয়ে।

পরের বছর অর্থাৎ সাতান্নোর ৭ই মার্চ মাওয়ি ও খোদোয়া রওনা হল চট্টগ্রাম। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার চেষ্টা করেও কাজ

হল না। শেষে ব্রহ্ম সরকারের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায় কক্সবাজার টেকনাফ হয়ে দু'জনে পৌঁছল আরাকান। রেঙ্গুন যাওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও দুজনকে পাকিস্থানে ফেরৎ পাঠানো হল। ঢাকায় ফিরে সিকিউরিটি কণ্ট্রোলের স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীআর. আর. খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফিজোর সাক্ষরিত ছ'খানি দলিল এল তাদের কাছে। ঐগুলো এল পাকিস্তানী সি, আই. ডি. অফিসারের হাত দিয়ে। ঐ দলিলের এক কপি সে পাঠাল নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকের কাছে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য, পাঠানো হল ফিজোর নির্দেশেই।

হঠাৎ একদিন মাওয়ি খবরের কাগজে দেখতে পায় যে, কোহিমাতে একটি শান্তি সম্মেলন বসেছে। সে ঐ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ঢাকা থেকে ট্রেনে রওনা হল সিলেটে। সেখান থেকে বাসে এল জাফিগঞ্জ। রাত কাটাল এক নৌকোর ভিতরে। তারপর নানা ঝামেলা সহ্য করে পাকিস্তানী পুলিশের সাহায্যে এল ভারতীয় সীমান্তে। নয় আগস্ট নৌকো করে এল বদরপুরে। পাকিস্তান থেকে সিরাজ নামে একটি ছেলে এসেছিল তার সঙ্গে। ছেলেটি বদরপুর থেকেই পাকিস্তানে পালাল।

ঐদিন রাত্রেই শুরু হল নূতন অভিযান। দুর্গম বদরপুর, লামডিং পাহাড়ী রেলপথ। দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর বন্য জন্তুর দৌরাত্মে ভরা রাত্রির গভীর অন্ধকারে রেল লাইন ধরে হেঁটে সে চলল হারাঙ্গাজাও, মাইলং, ডিশার দিকে। তারপর হাফলং হিল হয়ে পালাবে নাগা পাহাড়ের আস্তানায়। বদরপুর থেকে এল হিলারা, বিহাড়া তারপর নাটিংগা। ততক্ষণে রাত পুইয়ে গেছে। আশেপাশের চা বাগানের চা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল কয়েক ঘণ্টা। এদিকে বেলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খিদে বাড়ে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে চা গাছের ফাঁক দিয়ে রওনা হল আরও পূবের দিকে। এল দামছড়া। কিন্তু এমন সময় সাক্ষাৎ যমদূতের মতো হাজির হল ভারতীয় পুলিশ। বহুদিন থেকে

তারা অনুসরণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত সফল হল দামছড়া এসে। মাওয়ির হাতে উঠল কঠিন লোহার হাত কড়া, তখন ১০ই আগষ্ট দুপুর ১টা।

ঐ দিনই তাকে নিয়ে আসা হল শিলচর হাজতে। তারপরই হাজির করা হয় আশিষের আদালতে।

মাওয়ির কাছে পাওয়া যায় নাগা পাহাড় আর তুয়েনসাং এলাকার মানচিত্র। তার নিজের হাতে আঁকা একটা টেবিল ডায়েরী তাতে পৃথিবীর নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী টুকে রাখা। একটা লেট বুক, তাতে পিকিঙ এর এক কম্যুনিষ্টের নাম সাংকেতিক ভাষায় লেখা। আর আছে বাইবেল, বর্মার ডাকটিকিট,খবরের কাটিং, মাউথ অরগ্যান অসংখ্য প্রচার পুস্তিকা, দামী ক্যামেরা, কয়েকটি ঠিকানা। আর পাওয়া গেছে একটি মেয়ের ছবি, অতি যত্নে রাখা। সুন্দর মিষ্টি চেহারা। নাম মিস ওয়েনডে, ইংল্যাণ্ডে আছে। দার্জিলিঙে মাওয়ির সঙ্গে পড়ত। মেয়েটিকে মাওয়ি ভালবাসত।

খবর তো বেরোল আনন্দবাজারে, প্রশংসাও হল, কিন্তু ওদিকে আমার আর আশিষের প্রাণ যায় যায়। পি টি আই আনন্দবাজার থেকে তুলে খবরটা চালান করল বিদেশে। বিলিতি কাগজগুলোতে ফলাও করে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদক মশাইও আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। আমার খবরে উল্লেখ ছিল, তাকে লেখা ফিজোর চিঠির। এতদিন উনি ওটা চেপে রেখেছিলেন। আর পারলেন না, প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। আগের খেই ধরে ওটা আবার ছাপা হল পৃথিবীর সব কাগজে।

আর ওদিকে শিলচরে? অন্য কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা চেপে ধরলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ সুপারকে। কেন আনন্দবাজারের রিপোর্টারকে একা খবরটা দেওয়া হল? ওরা দু'জন বলেন, আমরা কিছু জানিনা। সংবাদদাতাদের দাবী, যদি না জানেন তা হলে কি করে সংবাদটা বেরোল তদন্ত করুন। মুশকিলে পড়ল আশিষ। বড় কর্তারা সন্দেহ করতে লাগলেন তাকে। স্থানীয়

সাপ্তাহিকগুলোও উস্কাতে লাগল পুলিশকে। অথচ আশিষের কোন দোষ নেই, আমার প্রতি কোন পক্ষপাতিত্বও দেখায় নি। ঘটনাচক্রে আমি হাজির ছিলাম সেদিন ওর আদালতে আর মাওয়ির স্বীকারোক্তিও পড়া হয়েছে প্রকাশ্যে। আমি শুধু এক কোণে বসে শুনেছি আর কাগজে টুকেছি।

যাই হোক আশিষকে দোষী প্রমাণ করা গেল না। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো পড়ল আমাকে আর পুলিশকে নিয়ে। শিলচর আর করিমগঞ্জের দুটি সাপ্তাহিক কাগজে আমি তখন নিজেই খবর।

অরুনোদয়-নামে একটি কাগজ ২৯।৮।৫৭ তারিখের কাগজে বড় বড় হরফে লিখল—"শিলচর পুলিশ বিভাগের ঝানু গোয়েন্দাগণ অতি সংগোপনে জিজ্ঞাসাবাদে সংগৃহীত নাগা গুপ্তচরের বর্ণিত বিবরন, যাহা শিলচরের সাংবাদিকবর্গ হইতে কঠোর গোপনীয়তায় এবং তাঁহাদের সহযোগিতায় রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, তাহা কলিকাতার কোনও এক বিশেষ সংবাদপত্রের স্টাফ রিপোর্টার শিলচর আসিয়া স্বল্পকাল মধ্যে নাটকীয় দ্রুততার সঙ্গে গত শনিবারের ইংরাজী ও বাংলা সংস্করণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া ধারাবাহিক কাহিনীর মতো সরস করিয়া প্রকাশ করেন এবং চিচিং ফাঁক করিয়া সরকারী গোপন ফাইলের অসহায়ত্ব প্রমাণ করিয়া দেন। প্রকাশ, গোয়েন্দাগণ এখন 'নাগা' ছাড়িয়া 'ফাঁকা'-র রহস্য ভেদে তৎপর হইয়াছেন।"

করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত যুগশক্তির মন্তব্য আরও বিশদ, তার একাংশ এইরূপ: কিন্তু গত শনিবারের কলিকাতার একটি দৈনিকে শিলচর হইতে ভ্রাম্যমান স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত বিশেষ সংবাদ হিসাবে উহা বাংলা ও ইংরাজী সংস্করণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া প্রকাশিত হয়। প্রকাশ উক্ত সংবাদদাতা ছুটিতে কাছাড়ের কোনও চা-বাগিচায় পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হইতে শিলচর দিয়া যাওয়া কালে শ্রীমাওয়ি সদর থানায় আটক আছেন জানিয়া তাঁহার নিজস্ব বিশেষ কৌশলে অনুসরণ করেন। ইহার পরই শ্রীমাওয়ির সঙ্গে গোয়েন্দা-গণের অত্যন্ত গোপনীয় জিজ্ঞাসাবাদের ফলে সংগৃহীত বিবরণের

খারাবা হক কাহিনী কলিকাতার উক্ত ইংরাজী ও বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই তথাকথিত গোপন তথ্য স্থানীয় সাংবাদিক বর্গের নিকট গোপন রাখিয়া কলিকাতার বিশেষ কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট কীভাবে বেফাঁস হইল এই বিষয় পুলিশ-সুপারের সহিত সেইদিনই এক জরুরী সাক্ষাৎকারে আসাম ট্রিবিউন, অমৃত-বাজার, যুগান্তর ও যুবশক্তি পত্রিকার প্রতিনিধিগণ গিয়া জিজ্ঞাসা করেন। এস্-পি সাহেব বলেন যে, এই গোপন তথ্য ফাঁসের ব্যাপারে যিনি বা যাঁহারা দায়ী তাহাকেই তিনি কঠোর শাস্তি দিবেন।

নানা রকম সমালোচনায় পুলিশ বড় মুশকিলে পড়ে। আমার পিছনে লাগল গোয়েন্দা। এমন মুশকিলে পড়লাম যে, আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি ঘুরব কী, টিকটিকি ছায়ার মতো ঘোরে। জানি না কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত, হঠাৎ এই সময় একজন খবর দিয়ে গেল গোপন তথ্য ফাঁস করার অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। কোন্ তারিখে কখন আমাকে ধরা হবে, সে সংবাদও জেনে গেলাম।

গোড়ায় একটু বিচলিত হলাম। মা-বাবার সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসেছি, এ আবার কি ঝামেলা। আবার রোমাঞ্চও হল উল্লাসে। একবার গ্রেফতার হতে পারলে আর আমায় পায় কে, আমি নিজেই তখন সংবাদের শিরোনামা। বর্তমানে আসামের মন্ত্রী এবং সে সময়ে শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীসতীন্দ্র মোহন দেবের বাড়িতে গিয়ে ব্যাপারটা বললাম। তিনি বললেন, একবার গ্রেফতার করে দেখুক না। আমরা হই-চই বাধিয়ে দেব। আর ছুদিন পর যখন ছাড়া পাবে, তোমাকে নিয়ে মিছিল বের করব শিলচরের রাস্তায়। মিছিল-টিছিল আমার তেমন পছন্দ হচ্ছিল না, তবে উত্তেজনায় উত্তেজনায় সেদিনটা কাটল কোন মতে। রাত্রে পুলিশ এসে আমাকে পাকড়াও করার কথা। সারারাত প্রায় জেগেই কাটালাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ এল না।

তা'হলে? তাহলে আমার খবরটা কি ভুল? না ভুল নয়। পরদিন দুপুরে শুনলাম পুলিশ শেষ মূহূর্তে পরামর্শ চায় সরকারী উকিলের কাছে। উনি প্রস্তাবটা শুনে হেসেই আকুল, বলেন, আপনাদের মাথা খারাপ নাকি? এই অভিযোগে কোন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা যায় না। আর করলেও বিপদে পড়বেন, প্রাইম মিনিস্টার, পারলামেণ্ট পর্যন্ত গড়াবে, আপনারা থই পাবেন না। ওসব প্রস্তাব শিকেয় তুলে রাখুন।

সংবাদের ইতি এইখানেই। উত্তেজনা শেষ, আমার ছুটিও শেষ। কলকাতায় ফিরে আসার পর সহকর্মীদের কাছ থেকে পেলাম অজস্র অভিনন্দন। কিন্তু মাওয়ি নাগার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেও যে গ্রেফতার হতে চলেছিলাম এ-খবর এযাবৎ কেউ জানতেন না, শিলচরের দু'চারজন ছাড়া।

## লালঘোড়ার সরাই

"এই ঘরে গ্যারিক ছিলেন?"

আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে সেণ্ট্রাল অফিস অব ইনফরমেশনের মিস্টার আলফ্রেড ইভানস বলেন, "হ্যাঁ, এই ঘরেই। ১৭৬৯ সনে এখানে যখন শেক্সপীয়ার জুবিলি উৎসব হয়, খ্যাতনামা নট গ্যারিক এসেছিলেন পরিচালনা করতে, এবং উঠেছিলেন এই রেড হর্স হোটেলেই।

একুশ নম্বর ঘরটার দিকে আবার ভাল করে তাকাই, খাট টেবিল আয়নায় হাত বুলোই। কেননা আমিও যে এক রাত কাটাতে ওই ঘরটিতে আশ্রয় নিয়েছি।

স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-এভনে ব্রীজ স্ট্রীটের ওপর এই রেড হর্স হোটেল। রয়েল শেক্সপীয়ার হোটেল থেকে মাত্র তিনশ গজ দূর, হেনলী স্ট্রীটে শেক্সপীয়ারের বাড়ি আড়াই শ'গজও নয়।

এইমাত্র 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম' অভিনয় দেখে এসেছি।--এ পর্যন্ত আমার জীবনে সর্বপেক্ষা স্মরণীয় সন্ধ্যা আজকেরটি। আলোর চোখ ধাঁধানি নেই, মঞ্চসজ্জার ভোজবাজি নেই, স্রেফ অভিনয়ের জোরে পুরো তুঘণ্টা পরিচালক পিটার হলের এই অভিনেতা গোষ্ঠী মাতিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে 'বটমে'র ভূমিকায় পল হার্ডউইকের তুলনা নেই।

লণ্ডনে কভেণ্ট গার্ডেন রয়েল অপেরা হাউসে ওই একই নাটক দেখেছি—প্রযোজনা জন গিল গুডের। কিন্তু নির্দ্বিধায় বলতে পারি স্ট্রাটফোর্ড-আপন-এভনের অভিনয়ের সঙ্গে তুলনায় সে জিনিষ পানসে।

এভন নদীর পারে থিয়েটারের বাড়িখানাও চমৎকার। এই ছোট্ট বাড়িটির নক্সাকার শ্রীমতী এলিজাবেথ স্কট। নতুন তৈরি হয়েছে ১৯৩২ সনে। আগের বাড়ি পুড়ে যায় ১৯২৬ সনে, আগুনে।

থিয়েটার দেখার আগে ঘুরে এসেছি শেক্সপীয়ারের বাড়ি, এবং অ্যান হ্যাথাওয়ের কটির; হোলি ট্রিনিটি চার্চ—যেখানে মহাকবির দেহ সমাধিস্থ।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি শেক্সপীয়ার যে বাড়িতে জন্মেছিলেন. তার আসল চেহারা আজ আর নেই, তবে এমন কায়দায় ঘরদোর আসবাব পত্র রাখা হয়েছে, দেখে মনে হবে, বুঝি সব কিছুই চার শ বছর আগেকার।

কাঠের কাঠামোয় তৈরি এই তিন ঘোমটাওলা দোতলা বাড়িটি জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে কেনা হয়েছে ১৮৪৭ সনে। তারপর এলিজাবেথীয় কায়দায় অনেক খেটেখুটে সব সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ঠিক যেমনটি থাকা চাই।

আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে দোতলায় কবির জন্মগৃহ। কাঠের মেঝে ও নীচু সীলিং। কড়ি বরগাও আঁকাবাঁকা ধরণের। ঘরের মাঝখানে পালঙ্ক। এবং কোণে ছোট শিশুর জন্যে ছোট্ট একটি দোলনা।

আসল বিস্ময় কিন্তু লুকিয়ে আছে বাঁ দিকের জানালার কাঁচে। ভারতবর্ষের যে কোন দ্রষ্টব্য স্থানে গেলে আমরা যেমন দেখি মন্দিরের গায়ে বা পাথরের আঁকাবাঁকা অসংখ্য পেরেক দিয়ে হিজিবিজি অনেক কিছু লেখা নাম খোদাই করা। তেমনি ওই জানলার কাঁচও নানা সময়ে যাঁরা এই বাড়ি দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকে নিজের নাম খোদাই করে গেছেন ওই জায়গাটিতে।

সম্প্রতি ওই 'ভ্যাণ্ডলিজম' থেকে কয়েকটি নাম উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারপ্রাপ্তদের তালিকায় আছেন টমাস কার্লাইল, আইজ্যাক ওয়াটস, স্যার ওয়াল্টার স্কট, জন ট্রল, হের্নরি আরভিং, এলেন টেরী—বিশ্ববিশ্রুত কয়েকটি নাম।

এভন নদীর পারে এই স্ট্রাটফোর্ডে এসে আমার কেবলই মনে হয়েছে যেন শান্তিনিকেতনে এসেছি, 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম' দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, বছর পনের কুড়ি আগেকার শান্তিনিকেতনে

'শ্যামা' কিম্বা 'চিত্রাঙ্গদা' দেখছি। এবং এখানে এসে সবসময় মনে হয়েছে, মাথার উপর আছে যেন বিরাট প্রতিভার চন্দ্রাতপ—তারই তলায়, তারই আশ্রয় নিরাপদে রয়েছি—শান্তিনিকেতনে পা দিলেই আমার যা মনে হয়।

তা যাকগে, রেড হর্স হোটেলের ঢাউস লাউঞ্জে বসে আমার গাইড মিস্টার ইভান্স বলেছিলেন এই জায়গাটার অনেক কথা। সৌম্যদর্শন, উত্তর পঞ্চাশ এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দুই বক্ বক্ করে চলেছি।

ইভান্স বললেন "এই স্ট্রাটফোর্ডের নামডাক শেক্সপীয়ারের জন্মস্থান বলে। খাঁটি কথা। কিন্তু এখানকার আরও অনেক আকর্ষণ আছে।"

"কী রকম?"

"এই এলাকাটা হচ্ছে টিপিক্যালি ইংলিশ, একে বলা হয়, 'দি হার্ট অব ইংল্যাণ্ড'।"

"ঠিক বলেছেন, অক্সফোর্ড থেকে আসার পথে কি চমৎকারই না লেগেছিল। সবুজ মাঠ, সোনালী ফসল, ঘন বন, অতিকায় অতিকায় দুর্গ এবং গির্জের পর গির্জে মোটর রাস্তার দুধার ছড়িয়ে আছে।"

"শুধু তাই নয়, এই যে হোটেলে আপনি উঠেছেন, তাও কম ঐতিহাসিক নয়।" ইভান্স চুরুট চিবোতে চিবোতে বলে চলেন—"শেক্সপীয়ার যখন বেঁচে ছিলেন এবং এই শহরেই থাকতেন, তখন থেকেই এই হোটেলের নাম। তখন এদেশে ঘোড়ার গাড়ির যুগ। আসা যাওয়ার পথের ধারে সহিস আর ঘোড়সওয়ারের দল এখানে বিশ্রাম নিতেন। তার থেকেই হোটেলের নাম রেড হর্স—লাল ঘোড়া।

প্রথম চার্লস যখন রাজা তখন থেকে এর পরিচয় বিস্তার আর জানেন তো এই হোটেলের আর একটি নাম 'ওয়াশিংটন আরভিং হল।'

"কোন আরভিং ? সেই মার্কিণ লেখক ?" আমি প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ তিনিই"—ইভান্স জবার দেন—"১৮১৫ সনে আরভিং এই হোটেলের একটি কোঠায় অনেকদিন ছিলেন এবং এখানেই তাঁর বিখ্যাত বই "স্কেচ বুকের" অনেকখানি বাড়িটা। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৫১ সালে আবার ঢেলে সাজানো হয়েছে। সব আগেকার চেহারা আর নেই।"

"তবে যে বললেন, আমার ঘরটাতে গ্যারিক ছিলেন ?"— আমি প্রশ্ন করি।

"গ্যারিক এসেছিলেন এবং এই হোটেলেও উঠেছিলেন ঠিকই, তবে কোন ঘরে কেউ বলতে পারে না। আপনার মনে রোমান্স জাগাবার জন্যেই ওই কথা তখন বলেছিলুম"—ইভান্স হাসতে হাসতে বলেন—"চলুন" অনেক রাত হল, এবার শুতে যাওয়া থাক। আচ্ছা; গুড নাইট।"

## নিঃসঙ্গ নিকেতন

যদি কোনদিন মিউনিক যান, লিণ্ডারহোফ কাস্‌ল দেখে আসতে ভুলবেন না। জার্মানদেশ সফরের গোড়াতেই আমি লিণ্ডারহোফ-দুর্গে পাড়ি দিই, পাহাড়ের বুকে কারুকার্যের অমন মহিমা দেখে বিস্ময়ে অবাক মানি।

দুর্গটি মিউনিক থেকে বেশী দূরে নয়। ওবেরামারগাউ আর এটাল মঠ পেরিয়ে সোজা যাওয়া যায়। যে-কোন একটি দিনের ভোরে চওড়া হাইওয়ে বরাবর একটার পর একটা হ্রদের কোল ঘেঁসে ছুটলেই লিণ্ডাহোফ—আল্পসের কোলের তাজমহল।

এঁকে-বেঁকে চড়াই ডিঙোতেই হঠাৎ সামনে আলোর ঝলকানি। পেঁজা তুলোর মত বরফ ঝড়ে পড়ছে কার আর দেওয়ার গাছের ডালে, পাতায়। তারই মাঝখানে সুর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে এক অতিকায় রাজপ্রাসাদের চুড়োয়। গাইড বললেন 'হ্যাঁ, এটাই লিণ্ডারহোফ, পাগলা রাজা দ্বিতীয় লুডভিগের একক সন্ন্যাস জীবনের আলয়।"

দ্বিতীয় লুডভিগ বাভারিয়ার তখ্‌তে বসেন ১৮৬৪ সালে। তখন তার বয়স উনিশ। বাস্তব জীবনের ধুসরতা দূরে ঠেলে বছরের পর বছর তিনি কল্পনার জাল বুনে চলেন। তখতে বসেই ঠিক করে ফেলেছিলেন, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।" সব ছেড়েছুড়ে তিনি ঠাঁই নেবেন কোন নিঃসঙ্গ নিকেতনে।

লুডভিগের বাবা দ্বিতীয় মাক্সমিলিয়ান আল্পসের গ্র্যাসভাং উপত্যকায় লিণ্ডার পরিবারের নাম দিয়ে একটি ছোট বাড়ী কিনেছিলেন শিকারের জন্যে। তাঁর বাড়ীটার নাম দিয়েছিলেন লিণ্ডারহোফ। দ্বিতীয় লুডভিগ স্থির করেন এইখানেই তিনি এক দুর্গ বানাবেন। জীবনের বাকী কটা দিন এই নিভৃত উপবনেই কাটিয়ে দেবেন।

রাজার যখন বয়স তেইশ দুর্গ বানানোর কাজে হাত দিলেন।

পয়লা পাঁচ বছর কেটে গেল নকশা বাছাই করতেই। শেষ ডাকা হল নাম করা স্থপতি ডলমানকে। ঘরের ভেতরের কারুকার্যের ভার নিলেন কোগাগালিও, ইয়াংক স্তুলাপে প্রমুখ কয়েকজন শিল্পী। বাগান বানাতে হাত দিলেন সে যুগের ডাকসাইটে উদ্যান শিল্পী কন একনার। বাইজেন্টাইন, ফরাসী এবং বারোখ রীতিতে খোদাই, ঢালাইয়ের কাজ সেরে এবং ইরান, মিশর, ভারত, জাপান, ইতালি, ফরাসী ইত্যাদি নানাদেশের শিল্প সম্ভার উজার করে এনে তিলোত্তমার মত এক আশ্চর্য মহিমান্বিত ভবন তিনি নির্মান করলেন আল্পস পর্বতের চূড়োতে।

প্রথম ঘরটাতে ঢুকতেই সোনার কাজ করা ডাউস একটা পিয়ানো। গাইড বললেন, এটাতেই রাজার বন্ধু ভাগনার স্থুরো ইন্দ্রজাল বুনতেন।"

যে ঘরেই ঢুকি, চোখ ধাধিয়ে যায়। উপর নীচ, ডান বাম সকল দিকেই বিলাস ব্যসনের ছড়াছড়ি। সংগী গাইডের মুখে ফুলঝুরি, "এইটে বার্মা থেকে, এই আতরদান ভারত থেকে, এই ময়ূরপঙ্খী সিংহাসন ইরান থেকে, এই আলোর ঝালর ব্রুসেলস থেকে— ইত্যাদি ইত্যাদি।

একতলা দোতলা অসংখ্য ঘরের গোলকধাধা পেরিয়ে আর একটু উপরে মুরিশ কিয়েস্ক। একা আল্পসের দিকে অপলক চোখ মেলে রাজা লুডভিগ এই ছোট্ট কারুকার্যমণ্ডিত ঘরটিতে বসে থাকতেন, আর অলস উদাস্যে ধুমপান করতেন কিংবা মদের বাটি ঠোঁটে তুলে ধরতেন।

কিয়েস্কের কিনারেই গুহাগৃহ—ভেনিসের গ্রোটো। আরব্য রজনীর আলাদিনের প্রহরীর চিচিং ফাকে বড় পাথরের টুকরো হঠাৎ সরে যায় এবং সব গলি বেয়ে অন্ধকার গুহার ভেতরে ঢুকতেই অন্য জগৎ।

গোটা জিনিসটাই কৃত্রিম। এবং আলো ফেলতেই ভোজ-বাজী। চার ধারে পাথরের দেয়াল শিলাকাজ এবং অপেরামঞ্চের অনুকরণ

এককোনে। মঞ্চের সামনেই ছোট লেক। তার নীল জলে পাল্ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা নৌকা। সব দেখে শুনে মাথা খারাপ হবার যোগার, সংগী মার্কিন দম্পতিটি ডুয়েটে চিৎকার পাড়লেন।

গুহা গৃহ থেকে বেরিয়ে আমার মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল অতীত ইতিহাসের পাতায়। ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলুম নেপচুন-ফাউণ্টেনের দিকে। আর ভাবছিলুম দ্বিতীয় লুডভিগকে। এই রেজ ক্যাবিনেট, এই হল অব সিরার, এই ওয়েষ্ট গোবেলিন, চেম্বার সব ঘরেইতো বিলাসিতার চূড়ান্ত। তবে কেন মিউনিক রাজপ্রসাদ ছেড়ে এখানে তিনি চলে এসেছিলেন। কেন? মনের শান্তি নিঃসঙ্গতা? নাকি অন্য কোন বিরহ বিষাদ?

গাইডকে প্রশ্ন করেছিলুম। ঠিক জবাব দিতে পারেনি। শুধু বলেছিল "ওই পাগলা রাজার খামখেয়ালীপনার কথা আর বলবেন না। গুচ্ছের টাকা উড়িয়েছেন আজে বাজে কাজে। তাঁর বন্ধুটিও জুটেছিল তেমনি। হ্যাঁ, সংগীত শিল্পী ভাগনারের কথাই বলছি। ওর পেছনে রাজা কম টাকা ঢেলেছিলেন।"

আমাদের কথা শুনে এক টুরিষ্ট মার্কিন মেজর এগিয়ে এল। বলল—"আমার মনে হয় রাজা ব্যর্থ প্রেমিক, নইলে এখানে চলে আসবেন কেন?'

"বাঃ রে তা কেন হবে" আমি জবাব দিই—"উনবিংশ শতাব্দীর রাজা, একটা গেলে পাঁচটা মেয়ে জোটে। তাঁর এত বৈরাগ্য হবে কেন? তাছাড়া বৈরাগ্যই বলি কি করে। লাখ লাখ টাকা খরচের যে নমুনা দেখলুম, তাতে একবারও মনে হয় না, রাজাবাহাদুর বিবাগী ছিলেন।"

আমাদের আলাপ আলোচনায় তিতি-বিরক্ত গাইড বললে "বললাম তো মশাই, ওঁর মাথায় ছিট ছিল। নইলে বনে-বাদাড়ে কেউ এত টাকা ওড়ায়। প্রেম টেম কিসসু নেই।"

গাইড চলে গেল। মার্কিন মেজরও ক্যামেরা বাগিয়ে ছুটল

ফোয়ারার দিকে। আমি মনে মনে বললুম: প্রেমিক না হলে এমন তাজমহল কেউ বানাতে পারে! বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি? না সেও তো হতে পারে না! হলে বিলাস ব্যসনের এত ছাড়াছড়ি কেন?

প্রশ্নের উত্তর পেলুম ফেরার পথে। এক বুড়ো জার্মান বিয়ারের গ্লাসে চুক্‌চুক্‌ চুমুক দিচ্ছিল পাশের রেস্টুরেণ্টে বসে। আলাপচারী হতেই একথা সেকথা। তৎক্ষণাৎ আমার সেই জিজ্ঞাসা।

বুড়ো বললে—রাজা ছোটবেলা থেকেই বিবাগী। ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন যন্ত্র-সভ্যতা তাঁকে পীড়া দিয়েছে, তাঁর মনে হয়েছে, কলকারখানা আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মারছে। তাই শহরে মন টেকে নি। পাগলের মত ছুটে বেরিয়েছেন শান্তির সন্ধানে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে। রাজাকে সবাই পাগল বলে। কারণ তিনি যুগের সঙ্গে তাল মেলাননি। তাঁর মন বরাবর ঘুরে বেড়িয়েছে কল্পনার জগতে। সেই কল্পনাকেই রূপ দিয়েছেন এই লিণ্ডারহোফে। এমন জায়গা তিনি বেছে নিয়েছেন, যেখানে চিমনির ধোঁয়া পৌঁছায় না, কলের আওয়াজ কানে তালা লাগায় না, লৌহদন্ত বিস্তার করে কারখানা হানা দেয় না। এমন রাজা ইতিহাসে দুর্লভ।

বৃদ্ধের উত্তর আমার মনের আর একটা দরজা খুলে দিল। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যন্ত্র সভ্যতার পীঠস্থান জার্মানিতে এসে এ কোন কাহিনী আমি শুনলুম।

কিন্তু রাজা দ্বিতীয় লুডভিগ কি বর্তমান ইউরোপে একক? বোধ হয় না। পশ্চিম ইউরোপের শহরে গ্রামে ঘুরে অজস্র লোকের সঙ্গে কথা বলে টের পেয়েছি, প্রায় প্রত্যেকের মনে দ্বিতীয় লুডভিগ বাসা বেঁধেছে। সকলের মনেই প্রশ্ন, যন্ত্র-সভ্যতার দানে সমৃদ্ধ আমরা কোন্ পথে চলেছি? এ পথের শেষ কোথায়?

তাদের প্রশ্নের উত্তর আমার দেবার কথা। কারণ আমি ভারতীয়, বিপরীত কোটির মানুষ। কিন্তু কোন জবাব দিতে পারিনি। আমরাও যে এখন একই পথের পথিক।

# পক্ষিরাজ

বন থেকে বেরোলো টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। টিয়ে হাতে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর মাথায় টোপর টাকের।

চেরাপুঞ্জির সার্কিট হাউস ঢাউসের বারান্দায় ডেক চেয়ার পেতে বসে আছি, আর হিমের কুঁড়ি ইলশেগুঁড়ির নাচ দেখছি। এমন সময় সামনের ঝোপ থেকে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। যেন কুমোর বাড়ির আধা তৈরী পুতুল। মুখের আদলে এদিক-সেদিক করা বাকী, কালো তুলির পোঁচ দেওয়া বাকী ভদ্রলোকের চুল, ভুরু বেমালুম উধাও। কপাল মাথা মিলে গড়ের মাঠ। চোখের 'সকেটে' পোয়াটাক তেল রাখা যায় এবং হঠাৎ-ঢালু তোবড়ানো গাল দুটোতে গলাগলি—থুড়ি 'গালাগালি' হচ্ছে হরবখত। আর নাক? যেন চার আনা দামের সিঙ্গাড়া। পরণে শার্ট প্যাণ্ট, পায়ে একপাটি জুতো, হাতে পোষা টিয়ে পাখি। বয়স সত্তর পেরিয়ে। ইনিই ডক্টর কোয়েলৎস,—মিগিচান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো।'

বর্ষণক্লান্ত চেরাপুঞ্জির নির্জন সার্কিট হাউসে এই সময়ে এক বঙ্গসন্তান পরম নিশ্চিন্তে বসে আছে দেখতে তিনি বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন না। একটু অবাক হলেন। ভারতনাট্যমের ভঙ্গীতে হাড়গিলে গলা হঠাৎ এগিয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর নেংচাতে নেংচাতে কাছে এসে হাজির।

উঠে দাঁড়ালাম। 'হ্যালো'- বলে বরফ-ঠাণ্ডা ডানহাতটা এগিয়ে দিলেন। পরিচয় দিলাম। বাঁ হাতের দাঁড়ে বসে থাকা টিয়ে-পাখির গায়ে ডানহাত বুলোতে বুলোতে কোয়েলৎস নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন—'বছর দুই আছি আসামে,—নাগাপাহাড় গারোপাহাড়, শিলঙ, চেরাপুঞ্জি—এই চলছে। এই সার্কিট হাউসে আছি কয়েক মাস। কাজ? সে অকাজের কাজ। পাখি জোগাড় করা।'

আমি মনে মনে ভাবি, পাখি জোগাড় করা? সে আবার কি কাজ? এই ভদ্রলোকের নামও শুনিনিতো কোনদিন?

আমার সঙ্গী বিল স্মল এই সময় বেরিয়ে এল কোণের ঘর থেকে। বিল বিশ্বভারতীর মার্কিন ছাত্র। দু'জনে শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি বেড়াতে এসেছি। বিলের সঙ্গে ডক্টরের পরিচয় করিয়ে দিলাম। এবং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বিলের সঙ্গে ইংরেজী বলতে বলতে এবং 'এটা কি', 'সেটা কি, ইংরেজীতে বোঝাতে হাঁফ ধরে গেছে। ডক্টর কোয়েলৎসের সঙ্গেও আর এক দফা ইংরেজীর কসরৎ।

বিল একজন পাকা বাক্যবাগীশ, ডক্টরও কম যান না। দু'জনে পাল্লা দিয়ে কথার দৌড় চলল। আমি মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ, করি।

জানা গেল, ডক্টর কোয়েলৎস্ জাতে জর্মন। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। বাঘা পণ্ডিত। পাখি সংগ্রহ করা কাজ। পাখিদের নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, বহু বইও লিখেছেন। ইদানীং সংযুক্ত আছেন মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্যে পাখি সংগ্রহের কাজে ছিলেন প্রায় কুড়ি বছর। নানান রকম পাখির নমুনা জোগাড়ে তিনি জীবনপাত করেছেন। নানা দেশ ঘুরে এখন এসেছেন চেরাপুঞ্জি—আসামের দুষ্প্রাপ্য পাখি সংগ্রহের কাজে। 'পক্ষীরাজ' কোয়েলৎসের সঙ্গে হঠাৎ এমনিভাবে সার্কিট হাউসে দেখা হয়ে যাবে, আমরা ভাবতে পারিনি।

ডক্টর বললেন—"টেক্ রেস্ট, আমি একটু আসছি।—আর হ্যাঁ, আজ রাত্রে আপনারা দুজন আমার গেস্ট। সার্কিট হাউসের খানসামা চমৎকার চিকেন কারি রাঁধে।"—আমি কিছু বলার আগেই বিল ঘাড় নেড়ে দিয়েছে। ডক্টর তার ঘরে ঢুকে গেলেন।

বিলকে বললাম—এত চটপট নেমন্তন্নটা নেওয়া কি ঠিক হল?

"কেন ঠিক হবে না"—বিল গজরায় "পরের পয়সায় চিকেনকারি খাওয়াটা এমন কি মন্দের? মুরগীও খেলাম, পয়সাও খরচ হল না, এমন সৌভাগ্য ক'দিন আর জোটে"—

বিল স্মল সম্পর্কে একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। এই ধরণের

বিদেশী ছাত্র শান্তিনিকেতনে কদাচিৎ এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিল ছিল সৈনিক। যুদ্ধশেষে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূবিদ্যায় বি-এ পাশ করে। সম্পন্ন ঘরের ছেলে।

১৯৫০ সালের কথা। ভগ্নীপতির সঙ্গে নিজের গাড়িতে লংড্রাইভে বেরিয়েছে। দুর্ঘটনায় গাড়ি ভেঙে চুরমার। বীমা কোম্পানী থেকে বিল প্রচুর টাকা পেল। সেই টাকায় চলে এল ভারতবর্ষে ১৯৫১ সালে। ভারতবর্ষে আসার শখ ছিল তার অনেক দিন।

ভারতে এসে ঘুরতে ঘুরতে একদিন শান্তিনিকেতন। জায়গাটা ভাল লেগে গেল। ব্যস, অন্য প্রোগ্রাম বাতিল করে ভর্তি হয়ে গেল বিদ্যাভবনে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এম-এ কোর্সে।

বিশ্বভারতীর অন্য দশজন বিদেশী ছাত্র ও অধ্যাপকের মত বিল স্মলও কোটপ্যাণ্টের খোলস ছেড়ে রাতারাতি পাজামা পাঞ্জাবি ধরল, পা থেকে জুতোজোড়াও খুলে ফেলল। আর 'কুব বালো, 'আচ্চা মসায়',—এই দুটো বাংলা কথা পুঁজি করে শিশুবিভাগের ছোট ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বেড়াতে লাগল।

বিল কিন্তু বাঙালীপনায় এগিয়ে গেল আর এক ধাপ। ঘরে নিয়ে এল এক খানদানি গড়গড়া। সিগারেটের বদলে গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানে, হোস্টেলের বারান্দায় খালি গায়ে লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়ায়, গ্রামে গ্রামে চক্কর মারে, খিচুড়ি, মালপো পাঁচ আঙ্গুলে চেটেপুটে খায়। সেই বিল স্মল ১৯৫২ সালের গরমের ছুটিতে আমার সঙ্গে শিলং বেড়াতে এল। উঠলাম এক কাকার বাড়িতে। এসেই বিল বলল—"আমার জন্যে নো স্পেশাল অ্যারেঞ্জ-ম্যাণ্ট; দুপুরে ডাল ভাত মাছ, সকালে দুধ মুড়ি কিংবা লুচি আলুর দম, রাত্তিরে মাছ মাংস ডিম যা খুশি, পুঁই ডাঁটার চচ্চড়ি হলেও আপত্তি নেই; তবে রিমেম্বার, নট দ্যাট হিল্‌স্য ফিস্‌; উফ্‌, দ্যাট কাঁটা বিজনেস্‌ ইজ্‌, ইজ্‌ হরিব্‌ল্‌!"

শিলং থেকে দুজনে একদিন বাসে চড়ে চেরাপুঞ্জি হাজির। বাসের পেছনে মালের ঝুড়ি। সামনে জনা আষ্টেক প্যাসেঞ্জার। পাইপ

মুখে খাশিয়া ড্রাইভার এক একটা মরণ-বাঁক পেরোয় আর আমরা হাজার ফুট খাদের নীচে গড়িয়ে পড়া মৃত্যুর হাত থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে বাঁচি।

চেরাপুঞ্জি পৌঁছে শুনি, ফেরার বাস নেই। পরদিন সকালে শিলং যাবার বাস। কী সর্বনাশ! কোথায় রাত কাটাই তাহলে? টিপির টিপির বৃষ্টি আর সড়াক সড়াক্ বৃষ্টিভেজা হাওয়ার ফলা—এর মাঝখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলবে কোথায়? এমন জানলে তো অন্য বন্দোবস্ত করা যেত! মুশমই জলপ্রপাত আর চেরাপুঞ্জি-ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে দেখে যখন বাজারের কাছে এলাম তখন বিকেল চারটা। খুঁজতে খুঁজতে পেলাম সার্কিট হাউস। সেখানেই ডক্টর কোয়েলৎসের সঙ্গে দেখা।

ডক্টর কোয়েলৎস তাঁর ঘরে আমাদের নিয়ে এলেন। ঘরের ভেতর ইতস্তত ছড়ানো সরু মোটা বই, কাগজপত্র। আর নানান রকম পাখির নমুনা। অদ্ভূত অদ্ভুত কত পাখিকে যে মরা পড়ে থাকতে দেখলাম তার সীমা সংখ্যা নেই।

এককোণে বসে আছে রূপচাঁদ—ডক্টরের সহচর। রূপচাঁদ জাতে পাঞ্জাবী। ডক্টরের সঙ্গে সঙ্গে আছে বহু বছর। তাঁর সঙ্গে দুবার আমেরিকাও ঘুরে এসেছে। দেখলাম, মেঝেতে বসে রূপচাঁদ মরা পাখির ভেতরকার হাড়গোড় মাংস নরুণ দিয়ে বের করছে, ভেতরে তুলো পুরছে, আর বাইরে খোলসটা ঠিক ঠিক রেখে তুলো ভর্তি পাখিকে সুতো দিয়ে বাঁধছে। হাজার হাজার পাখির পাহাড় জমা হচ্ছে পেছনের কুঠরী ঘরে।

ডক্টর বললেন—"চমৎকার লোক এই রূপচাঁদ। ও না থাকলে আমায় অনেক অসুবিধেয় পড়তে হত।"

রূপচাঁদ মুচকি মুচকি হাসে আর সুতো বাঁধার কাজ মেসিনের মত চালিয়ে যায়। ডক্টর বললেন—"এই পাখিগুলো নিয়েই আমার গবেষণা। পাখির পাহাড় চালান হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায়। পাখি সম্পর্কে গবেষণার কাজও চলছে। এখান থেকে টাইপ করে প্রবন্ধ

পাঠাই, বিশ্ববিদ্যালয় ছাপার ব্যবস্থা করে। এই চলছে গত তিরিশ বছর।"

সার্কিট হাউসের চৌকিদার দুটো হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এল। চেরাপুঞ্জিতে অন্ধকার নেমেছে। পাহাড়, গাছপালা, বন, সব ঝাপসা ঝাপসা। দূরে সিলেটের সমতলভূমি আর দেখা যায় না। শুধু ঠাণ্ডা হাওয়ার সরসরানি বৃষ্টির নূপুরের ঝমর ঝমর।

ডক্টর বললেন—"চলুন বারান্দাতেই বসি।" তিনজনে তিন ডেকচেয়ার টেনে বারান্দায় বসে পড়লাম। চারিদিকে অন্ধকার। লণ্ঠনের মিটমিটে আলো কেমন যেন রহস্যময়। সেই আলোতে ডক্টরের মুখ আরও অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

জিগ্‌গেস করলাম—এই পাখি সংগ্রহে লাভটা কি বলতে পারেন?

"লাভ?"—ডক্টর ফোঁকলা দাঁতের হাসি ছড়িয়ে বললেন—"লাভ বিশেষ নেই কৌতুহল মেটানো ছাড়া। এই পৃথিবীতে আমাদের পাশাপাশি যে সকল জীবজন্তু বাস করছে, তাদের সম্পর্কে যত বেশী জানা যায়, ততই আনন্দ আর উৎসাহ বাড়ে। এবং এই জন্যেই অনেক দেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, লাখ, লাখ পাখির খোলস সযত্নে রাখা হচ্ছে।"

ডক্টর একটু দম নিয়ে আবার বললেন—"তাছাড়া কোন কোন পাখি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। যেমন ধনেশ পাখি। ওষুধের কাজে লাগে। শস্য রক্ষা ও ধ্বংসের কাজে অনেক পাখির নামডাক আছে। আর মানুষের খাদ্য হিসেবে তো অনেক পাখিই লাগছে।"

লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় দেখলাম, মানুষের খাদ্যের কথা শুনে চোখমুখ চকচক করছে। আন্দাজ করতে পারি, তার সামনে তখন একটা আস্ত মুরগী ককর-কোঁ করে উঠেছে। চিকেন-কারির কথা আর কত বাকী?

তামসিক চিকেন-কারির কথা ভুলে আমি সাত্ত্বিক কবিতার রাজ্যে

এলাম। মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল জীবনানন্দ দাশের কবিতা
—'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে তুমি
আর কেঁদনাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে—'

ডক্টর বললেন—"বেঙ্গলী পোয়েট্রি? দ্যাটস ফাইন।"

বিল চোখমুখ পাকিয়ে বলল—"ট্রান্সলেট ইট।"

কী সর্বনাশ! বিলটা আচ্ছা পাজী তো। ট্রান্সলেট করতে
হবে জানলে কবিতাটা বলতামই না। চিল তো জানি 'কাইট' আর
আর সোনালী ডানার চিলকে না হয় বললাম গোল্ডেন উইংগড্ কাইট
কিন্তু 'ভিজে মেঘের দুপুর' আর 'ধানসিঁড়ি?' তার ইংরেজী?
ইম্‌পসিব্‌ল্। বেগতিক বুঝে ক্যাবলার মত হেসে বললাম—"আরে
না, ওসব বাজে কবিতা, ট্রান্সলেট করার কোন মানে হয় না। আমি
বলতে চাইছি যে, আমাদের বাংলা কাব্যেও অনেক পাখির নাম
জড়িয়ে গেছে। যেমন কোকিল, চিল, বৌ কথা কও, চোখ গেল,
শালিক, দোয়েল, খঞ্জন, ময়না, বাবুই।"

বিল বললে, "সব দেশের সাহিত্যেই তাই।"

ডক্টরও সায় দিয়ে বললেন—"আসলে কি জানেন, এমনিতে মনে
হয়, বেশীর ভাগ পাখিই কোন কাজে লাগে না; কিন্তু এমন অনেক
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দৃষ্টান্ত আছে—গোড়ায় যাদের কোন বাস্তব
প্রয়োগ সম্পর্কে কেউ ভাবতেই পারেনি, অথচ পরে আমাদের জীবনের
প্রয়োজনে কত কাজেই না লেগেছে।"

"ভারতের পাখি সম্পর্কে কিছু বলুন"—বিল আর আমি দুজনেই
প্রায় একসঙ্গে বলি।

ডক্টর এক মোটা চুরুট ধরিয়ে স্থুরু করলেন।—"ভারতে পাখি
সংগ্রহ হচ্ছে গত একশ বছর ধরে। প্রায় এক লাখ পাখির নমুনা
সংগ্রহ করা হয়েছে। তার কিছু আছে কলকাতার যাদুঘরে। কিন্তু
ভারতীয় পাখির বৃহত্তম সংগ্রহ লণ্ডনে। এই সংগ্রহ সম্পর্কে লেখা বই
আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি।"

"বইটা কার লেখা"—বিলের প্রশ্ন।

"শুনে অবাক হবেন, বইটা লিখেছেন এক পুলিস অফিসার—আসামের ভূতপূর্ব পুলিসা বড়কর্তা মিস্টার স্টুয়ার্ট বেকার। বেকারের মত লোক অবসর বিনোদন হিসেবে এই রকম অনেক কাজ করে উত্তরসূরীদের দারুণ উপকার করে গেছেন। আমার ধারণা—" ডক্টরের কথা শেষ হতে না হতেই দুটো ছায়া এসে বারন্দার কাছে দাঁড়াল। আমরা চোখ তুলে তাকালাম। ছায়া ডাক দিল——'সাহেব।'

লণ্ঠন হাতে ডক্টর এগিয়ে গেলেন। আলোয় দেখলাম দুটি খাসিয়া যুবক। তাদের ঝুলিতে কয়েকটি পাখি। ডক্টর নেড়েচেড়ে পাখিগুলি রেখে দিলেন। কিছু পয়সা দিলেন দাম বাবদ। ওরা সেলাম ঠুকে চলে গেল।

ফিরে এসে ডক্টর আবার শুরু করলেন—"নিজে ঘুরে ঘুরে যেমন সংগ্রহ করি, তেমনি লোকেও পাখি দিয়ে যায়। পছন্দ হলে দাম দিয়ে কিনে নিই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার ধারণা, ভারতে প্রায় এক হাজার শ্রেণীর পাখি আছে। আর আসাম আমার মত পাখি জোগাড়ের স্বর্গরাজ্য। ঐ এক হাজার জাতের প্রায় সাতশ পঞ্চাশটির দেখা পাওয়া যায় এই আসামেই। তার কারণ আসামের বিশেষ ভৌগলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য। সমতলভূমি, ঘাসজমি, পাহাড়ী জমি, গভীর জঙ্গল, নদনদী, হ্রদ এমনকি বরফঢাকা পর্বতচূড়াও আসামে আছে। আসাম হিমালয় অঞ্চলের প্রায় মাঝখানে আছে বলে পশ্চিম এলাকায় যে সকল পাখির বাস, তারা এখানে অবধি ধাওয়া করে। আবার মালয়, ব্রহ্ম, কম্বোডিয়া, তাইল্যাণ্ড দেশের পাখিগুলোও পূর্ব দিক থেকে এখানে আসে। তাছাড়া এখানকার সর্বত্র প্রচুর জল, যাযাবর জলচর পাখি-দের কাছে তো মক্কা-মদিনা। সুযোগ পেলেই ছুটে চলে আসে।"

আমি আর বিল নীরব শ্রোতা। ডক্টর একনাগাড়ে বলে চলেছেন—"নানা জাতের পাখির মধ্যে কোন কোনটি দেখতে অদ্ভুত তাদের স্বভাবও বিচিত্র। ধনেশ পাখি চেনেন তো? ঐ যে

হাতির দাঁতের মত ইয়া ঠোঁটের বিরাট পাখি? আধ মাইল দূর থেকে তাদের উড়ে যাবার শব্দ শোনা যায়। এই ধনেশ পাখি আসামে আছে পাঁচ রকম। সবগুলি জঙ্গলে থাকে আর জংলী ফল খায়। আর একটি অদ্ভুত পাখি হাড়গিলা-দু রকমের। বড়টি দাঁড়ালে ৪।৫ ফুট উঁচু হয়। পাখার প্রসার প্রায় দশ ফুট। কিছু-দিন আগে গৌহাটির কাছে ঐ রকম প্রায় পাঁচশ হাড়গিলাকে এক ঝাঁকে উড়ে যেতে, দেখেছি।"

"হানি-গাইড আর এক রকম অদ্ভুত পাখি। এরা মৌমাছির উপর নির্ভরশীল। মোম ছাড়া কিছু খায় না। রং হালকা, আকার চড়ুই পাখির মত। এই পাখি আসাম ছাড়া আফ্রিকাতেও দেখেছি। হয়ত আফ্রিকা থেকেই এখানে এসেছে। আচ্ছা, আপনারা বাবুই পাখিকে তো চেনেন?—"

আমার চটপট জবাব—"চিনব না? খুব চিনি। কবিতাও পড়েছি—'বাবুই পাখিরে ডাকি কহিল চড়াই"—

বিল বলতে যাচ্ছিল—'হোয়াটস্ দ্যাট'। আমি এবার চোখ পাকিয়ে বলি—"ফের বিল। আগেই বলেছি না, নো ট্রানস্লেশান বিজনেস!" বিল মুচকি মুচকি হাসে।

ডক্টরের এদিকে খেয়াল নেই। তাঁর কথা তিনি বলেই চলেছেন। বোধহয় অনেকদিন পর কথা বলার লোক পেয়ে ঝুলি উজাড় করছেন। আমাদেরও শুনতে মন্দ লাগছিল না।

ডক্টর বললেন—"বাবুইর কথা বলছিলাম। বাবুইর সমগোত্রীয় আর একটা পাখি প্রায় ৭৯।৮০ বছর আগে দেরাদুনে আবিষ্কৃত হয়। অনেকে ভেবেছিলেন, এই পাখির অস্তিত্ব বোধহয় লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু গত বছর গোয়ালপাড়ায় এই পাখি আবার দেখা গেছে তবে এরা বাবুইর মত পাকা স্থপতি নয়। কিছু ঘাস টেনেটুনে যাচ্ছেতাই বাসা বানায়।"

পৃথিবীর দুস্প্রাপ্যতম একটি পাখির কথা বলি। এদের নাম 'পিগ্মি ফ্লাইক্যাচার', ক্ষুদে মক্ষিকাভুক। এদের রঙ নীল, কখনও

কখনও উজ্জ্বল কমলালেবুর রং। আর একটা দুষ্প্রাপ্য পাখি 'ক্যালিন'। অনেক আগে সিকিমে দেখা গিয়েছিল, আর দেখতে পাই না। মাত্র কিছুদিন আগে নাগা পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে 'ক্যালিন' পাখি নজরে পড়ে। তাছাড়া আরও কত অজস্র পাখি আছে, যারা ঝোপে ঝাড়ে, বনে বাদাড়ে লুকিয়ে থাকে, তাদের কথা কোন বইয়েই লেখা হয়নি। হয়ত একদিন লেখা হবে। কাজ চলছে। সেই কাজের নেশাতে, অজানাকে জানার নেশাতে আমিও বছরের পর বছর অরণ্যে পর্বতে প্রবাসেই দিন কাটাচ্ছি। এই পরিশ্রমের বদলে কি কিছু পাইনি? পেয়েছি, অনেক পেয়েছি। পাখির পেছন পেছন ঘুরে মোটেই ঠকিনি, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। জানি না, আর কতদিন এমনি ঘুরতে পারব। বয়স বাড়ছে।"—ডক্টর থামলেন।

আমি আর বিল নিশ্চুপ। আমাদের ধ্যান ভাঙল সার্কিট হাউসের খানসামার ডাকে।—"সাব্ খানা তৈরী।"

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় ৯টা। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। ডক্টর বললেন—"চলুন খেতে যাই।"

## স্থান কাল পাত্র

অবাঙালীদের কথা বাদই থাক, শান্তিনিকেতনে বরাবর বিদেশী ছাত্রছাত্রীর ভিড়। সেই ১৯২১ সাল থেকে। কেউ আসে নাচগান শিখতে, কেউ ছবি অাঁকতে। কেউ কেউ আসে আবার নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতে। কোর্সও হরেক রকম। একমাস থেকে চার বছর পাঁচ বছর।

আর শান্তিনিকেতনের গেরুয়া মাটির এমনই টান, দুদিনেই সাহেব-মেমদের ভোল পালটে যায়। খালি পা তো বটেই, ছেলেরা পরে পাজামা পাঞ্জাবি, মেয়েরা শাড়ি ব্লাউজ নয়তো শালোয়ার-কামিজ। খাওয়াও সেই কিচেনের ডাল-ভাত মাছের ঝোল।

বিদেশীদের দলে মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুশী, ইন্দো-নেশিয়ান, আফ্রিকান, তুর্কী, মিশরী সব দেশের লোক আছে। তাদের অনেকে সিরিয়াস স্টুডেন্ট, লাইব্রেরীতে মাথা গুঁজে দিনরাত বই পড়ছে। কারও কারও কোর্স বেশ মজার। যেমন একজনের হয়ত রবীন্দ্রসাহিত্য, সেলাই, মণিপুরি নাচ, হিন্দি। অন্যজনের আবার বাংলা, তবলা, বাটিকের কাজ, রবীন্দ্রসংগীত।

দীপচাঁদ বিহারী গুপ্ত নামে মরিসাসের একটি ছেলে পড়তে এল বছর আট আগে। সে এম. এ. পরীক্ষা দেবে ইংরেজিতে। সেই পরীক্ষায় তার থিসিসের বিষয় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য।' সে বাংলা জানে না, হিন্দি কিছু জানে। তাই এই সাহিত্য পড়ল হিন্দি অনুবাদে। থিসিস লিখল ইংরেজিতে। এবং দু'বছর কাটিয়ে দেশে ফিরল হিন্দিতে বাংলা সাহিত্য পড়ে ইংরেজিতে বিশ্বভারতীর এম, এ, ডিগ্রি নিয়ে।

পাজামা-শালোয়ারের মত বিদেশীরা এলেই রবীন্দ্রসংগীতের রসে জমে যায়। দুদিন যেতে না যেতেই দেখা যায়, অন্যান্যদের সঙ্গে ওরাও গলা মিলিয়ে গাইছে "হামদেড় শান্টিনিখেটান্—"

সকাল বেলা যখন ক্লাশ চলছে, শোনা গেল, ছাতিমতলার ওদিক থেকে মার্কিন ছাত্র জন বেরির গলা—'টোমাড় হোলো গুড়্, হামাড় হোলো শাড়া।' কিংবা বিকেলে পূর্বপল্লীর মাঠে বেড়াতে বেরিয়ে আপনমনে গান গাইছে তুর্কী গবেষক রাশী গোভেন—"যেটে দাও গেলো যারা"—

এই ব্যাপারে তাদের সবাইকে কিন্তু টেক্কা মেরেছিল রুশী ছাত্রী আলমির—আমরা সবাই যাকে 'মীরা' বলেই ডাকতুম।

মীরা আজারবাইজানের মেয়ে। বয়স সতের কি আঠারো। ছ'বছর আগে বৃত্তি নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিল রবীন্দ্রসংগীত শিখতে। বছর খানেক থেকে দেশে ফিরে গেছে।

মীরা পাঁচমিশেলি কোর্সে নাক গলায়নি, তার লক্ষ্য স্রেফ রবীন্দ্রনাথের গান। বাকুতে থাকতেই সে কোন একজন বাঙ্গালীর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুচার কলি শুনেই মুগ্ধ হয়ে যায়, ঠিক করে ওই গান শিখতেই হবে। মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাই সোজা চলে এল শান্তিনিকেতন।

এবং শুনলে অবাক হবার কথা, মীরা অল্প ক'দিনে এমন চমৎকার গান শিখল, বোঝার উপায় নেই সে রুশী, সে বিদেশী। পাকা একজন বাঙ্গালী গাইয়ের মত চমৎকার গলায়, চমৎকার উচ্চারণে সে রবীন্দ্রসংগীত ধাতস্থ করল। শুধু তাই নয়, বার্ষিক সমাবর্তনে শান্তিনিকেতনে এসে মীরার গান শুনে স্বয়ং জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত তাজ্জব।

মীরার সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে, দোল-পূর্ণিমায়। এবং সেদিনের স্মৃতি চিরকালের জন্য আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে।

দীর্ঘ বারো বছর কাটিয়ে আমি সেই সময়েই শান্তিনিকেতন ছেড়েছি। যোগ দিয়েছি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। 'বসন্তোৎসব' দেখতে গিয়েছি। সারাদিনের হৈ-হুল্লোড়ের পর রাত্রে বৈতালিক। শালবীথির ফাঁকে ফাঁকে বাসন্তী জ্যোৎস্নার প্লাবন। ফুলের গন্ধে মন

উতলা! এবং তারই সামনে দিয়ে চলেছে গানের মিছিল।—"ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে ধরা দিয়েছে।"—শালবীথি স্তব্ধ, বনপুলক স্তব্ধ, আম্রকুঞ্জের ডালে ডাকা কোকিল স্তব্ধ।

রাত আটটায় শ্রী অনিলকুমার চন্দের বাড়িতে গিয়ে বসেছি। শ্রীরানী চন্দও আছেন। দিল্লি থেকে ওঁরাও এসেছেন ছুটিতে।

বাইরে খোলা মাঠের মাঝখানে চন্দনে মাখা আকাশের তলায় আমরা কজন বসে আছি, এমন সময় হাজির কলকাতায় ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসেস অফ ইণ্ডিয়ার বড় কর্তা ডক্টর শার্ত্রা। সস্ত্রীক। এক মার্কিন দম্পতি রাতের ওই বৈতালিক শুনে মুগ্ধ। এসেই বললেন, "আরও গান শুনব,—টেগোর সঙ্।"

অনিলদা বললেন, "কেন, সকাল বেলার অনুষ্ঠানে এত গান শুনেও কি মন ভরল না?"

"সত্যিই তাই"—মিঃ শার্ত্রা বললেন—"একদম ভরেনি। এমন আশ্চর্য সুন্দর গান।"

এদিকে আমরা যারা এই আসরে উপস্থিত, সবাই অ-সুর, সাত চড়েও গলায় সুর বেরোয় না। তাহলে কাকে ডাকা যায়? একজন বললে—'আলমিরাকে আনা যাক।'

সবাই সমর্থন জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল গাড়ি, এবং মিনিট দশেকের মধ্যে আজারবাইজানের জাতীয় পোশাক পরা আলমিরা সশরীরে বর্তমান।

বেশী বলতে হলনা, মীরা তৎক্ষণাৎ গান ধরল—"দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি—"

আহা, গলাতো নয় মধু মধু।—সুর হয়ে ঝরে পড়ছে। যেমন চড়ায়, তেমনি খাদে; এই বিদেশী তরুণীর কণ্ঠের আশ্চর্য আরোহণ, অবরোহণ।—"আসিবে ফালগুন, তখন আবার শুন—।" আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি।

গান শেষ হতেই মিসেস শার্ত্রার উল্লাসধ্বনি—'এক্সকুাইজিট! আমরাও চেঁচালুম—"আর একটা।"

পরিষ্কার বাংলায় মীরা বললে—"কোনটা গাইব ?"

রানীদি বললেন—"যেটা খুশী !"

মীরা বললে—"আচ্ছা, তাহলে 'সকরুণ বেণু বাজায়ে যায়' গাইছি।"

মীরা গান ধরতে যাবে, এমন সময় অনিলদা অতিথি মার্কিন-দম্পতিকে বললেন—"জানেন, এই গান গুরুদেব ইন্দোনেশিয়ায় বসে লিখেছেন। তিনি তখন ওই দেশে গেছেন বেড়াতে। তাঁর জাহাজের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল এক ছোট নৌকো। তাই দেখে গুরুদেবের মনে পড়ে গেল দেশের কথা, শরৎকালের বাংলার কথা এবং সঙ্গে-সঙ্গে লিখে ফেললেন ওই গান।—"

অনিলদা থামতেই মীরা গান ধরল। তার গলায়, ও-গানেও, সাপ খেলাবার বাঁশি। মীরা গাইছে—

"তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে
হৃদয়মাঝে
শরৎ-শিশিরে ভিজে ভৈরব
নীরবে বাজে।
ছবি মনে আনে আলোতে ও গীতে
যেন জনহীন নদীপথটিতে,
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে
অলস পায়ে বনের ছায়ে।"

মিস্টার শার্ত্রা আর নিজেকে আটকাতে পারলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে মীরার হাত জড়িয়ে ধরলেন—,বললেন—"শাবাস ! এমন আনন্দময় মুহূর্ত জীবনে আর পাইনি।"

মিসেস শার্ত্রা—"আমিও।"

আমি বললুম—"আমার কাছেও এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। দুখানা রবীন্দ্রসংগীত সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আজ এক সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে।"

"আর জায়গাটাও দেখতে হবে"—

অনিলদা ফোঁড়ন কাটেন—"শান্তিনিকেতন। পূর্ব-পশ্চিম বাম-ডান সবাই মিলতে পারে এই একটিমাত্র জায়গাতেই।"

রাত তখন প্রায় দশটা। চাঁদের হাসি তখনও বাঁধভাঙ্গা। মীরা আর একটা গান ধরল।